মানন্দময়ী

তবার্তা

VOL.-20 ULY,2016

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

Branch Ashrams

1.	AGARPARA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati, Kolkata- 700058 (Tel. : 25531208)
2.	AGARTALA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P. O. Agartala-799001. West Tripura (Tel. : 0381-2208618)
3.	ALMORA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P. O. Almora-263602, (Tel. : 05962-233120)
4.	ALMORA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Dhaul-China. Almora-263881, (Tel. : 059620-262013)
5.	BHIMPURA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P. O. Chandod, Baroda-391105, (Tel. : 02663-233208+233782)
6.	BHOPAL	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M. P. (Tel. : 0755-2641227)
7.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur. P. O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P. O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Andamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Andamayee Ashram. Sadhana Ashram, 47/A, Jakhan Dehradun-248009
11.	JAMSHEDPUR	: Shree Shree Ma Andamayee Ashram. Near Bhatia Park,Kadam,Jamshedpur-831005
12.	KANKHAL	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kankhal, Hardwar - 249408, (Tel. : 01334-312565, 246575)
13.	KEDARNATH	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P. O.Kedarnath, Rudraprayag

মা আনন্দময়ী - অমৃত বার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২০ জুলাই - ২০১৬ সংখ্যা ৩

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত -১৫০ টাকা
বিদেশে- ২৪ ডলার অথবা ১৫০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা- ৪০ টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

১. ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

২. প্রধানত: শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয় গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

৩. প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশত: লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

৪. অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Managing Editor Ma Anandamayee-AmritVarta"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

৫. পত্রিকা অপ্রাপ্তির সংবাদ পত্রিকা প্রকাশনের এক মাসের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

৬. ঠিকানার কোন পরিবর্তন হইলে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পাদক কে জানাইলে ভাল হয়।

৭. সকল গ্রাহকদের অবগত করানো হইতেছে যে তাঁদের বার্ষিক চাঁদা সমাপ্ত হইবার আগেই যেন তাঁরা তাঁদের অগ্রিম চাঁদা প্রেষিত করেন।

পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে-

Managing Editor Ma Anandamayee-Amrit Varta

Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-221001

e-mail : amritvarta.vns@gmail.com / mataanandamayeepublication@gmali.com

---

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক প্রকাশক ড: ব্যানার্জী দ্বারা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী, সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১ উ: প্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং অনুপ প্রিন্টার্স, ডি ৪৭/৫৯ মৌলবী বাগ বারাণসী হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক- ব্রহ্মচারিণী ড: গীতা ব্যানার্জী (ইনচার্জ)।

বিষয়-সূচী

১. মাতৃবাণী		১
২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ	*-শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত*	২
৩. গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা		৫
৪. তীর্থদর্শন	*-ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা*	৮
৫. কৌমারী রূপ সংস্থানে	*-ব্রহ্মচারিণী জয়া*	১৩
৬. প্রার্থনার শক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস		১৬
৭. শ্রীশ্রী নির্মলানন্দময়ী গীতা	*-শ্রী গণেশচন্দ্র সেনগুপ্ত*	১৭
৮. জীবন দর্শন		১৯
৯. ভাঙা হাল - ছেঁড়াপাল (কবিতা)	*-শ্রী মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী*	২০
১০. পাদপীঠম্ স্মরামি	*-ব্রহ্মচারিণী গীতা*	২১
১১. ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	*-সুধীর দত্ত*	২৫
১২. তপোভূমি দর্শন	*-ড: সুচরিতা ঘোষ*	২৮
১৩. ভারতের অধ্যাত্মবাদ	*-ড: নলিনী ব্রহ্ম*	৩০
১৪. উপনিষদের আলো		৩২
১৫. বৃন্দাবন আশ্রমে যুগল মূর্তি স্থাপনা	*-স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ*	৩৩
১৬. ধন্য কাশী পুণ্যধাম	*-ব্রহ্মচারিণী গীতা*	৩৭
১৭. আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়	*-ডা: কবিতা ব্যাস (আয়ুর্বেদাচার্য)*	৩৯
১৮. ধর্মের সার	*-জোশীজী*	৪২
১৯. আশ্রম বার্তা		৪৩
২০. অমৃত লোকের পথ যাত্রী		৪৪

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অমৃতবাণী, অমর সন্দেশ, আদর্শ গাথার মাধ্যমে পত্রিকাকে রোচক করার প্রয়াস করা হচ্ছে। সকল পাঠকবৃন্দের নিকটে আবেদন জানানো হচ্ছে যে তাঁরা অবিলম্বে নিজের নিজের অভিমত লিখে পাঠান, যাতে আমরা তা সমাবিষ্ট করে বর্তমান যুগের সকল বয়সের পাঠকদের জন্য শ্রীশ্রী মায়ের অনুপম সন্দেশ আরও রুচিকর রূপে প্রস্তুত করতে পারি।

জয় মা। ধন্যবাদ

ঠিকানা :-
পাঠকদের অভিমত
সম্পাদক
অমৃত বার্তা
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদাইণী, বারাণসী

প্রচ্ছদপট

ছলিয়া মন্দির - বৃন্দাবন আশ্রম
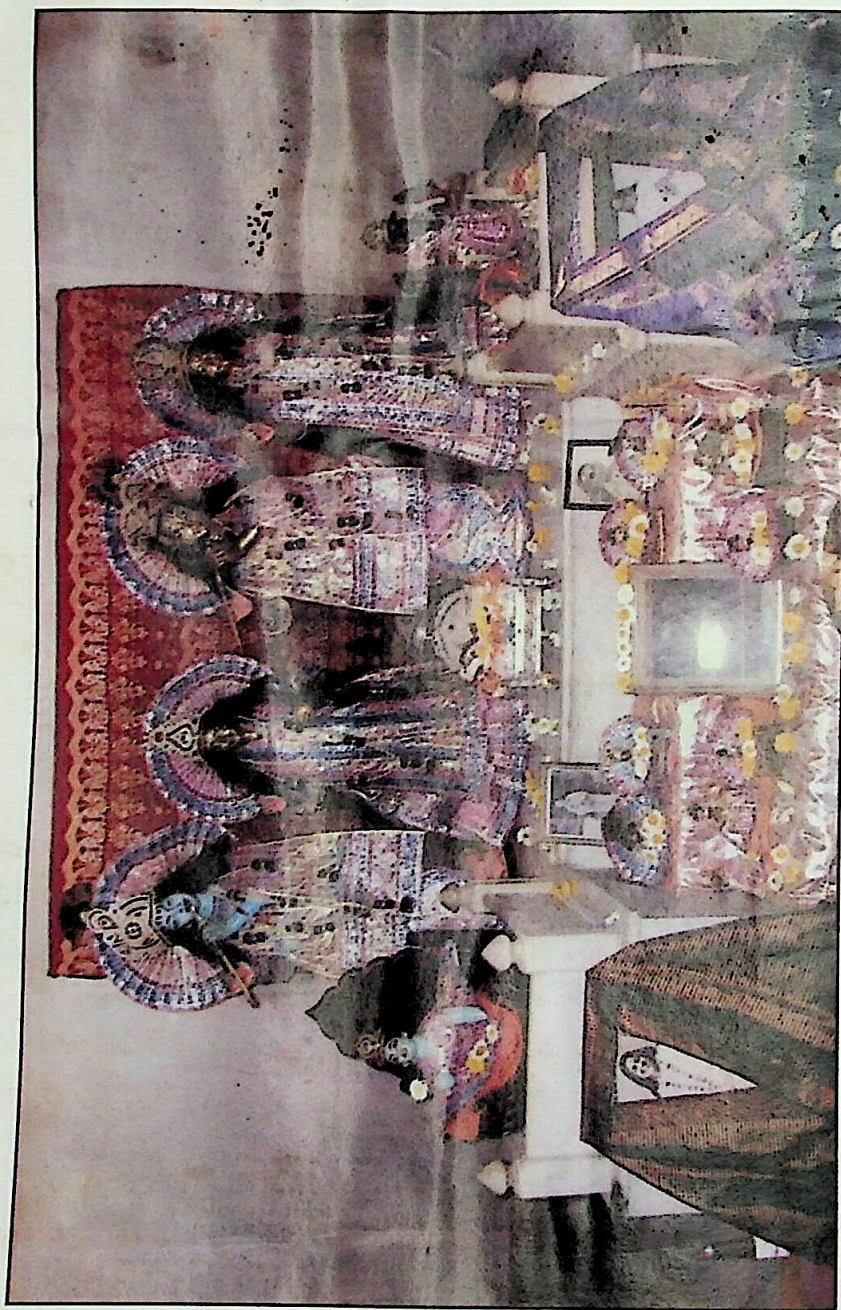
মাতৃ বাণী

মহাশূন্য একমাত্র তাঁর রূপ। যেখানে এই শূন্য সেখানে কিন্তু মহাশূন্য বুঝায় না। কি আছে কি নাই, আবার সবই আছেও নাইও। নাইও না, আছেও না। সব হারিয়ে সব পাওয়া, এইটাই কিন্তু চাই।

❁ ❁ ❁

এই যেমন তুমি আমি দুই জন। আবার তুমি আমি একই। এই যে দুজনের মধ্যে শূন্য আছে এও আমিই কিন্তু। দুই- এর কোনও কথাই নাই। রাগ দ্বেষ হয় দুই ভাব হতেই।

❁ ❁ ❁

এই যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, হাসছি, শুয়ে আছি তাও যেমন, আবার কখনও কখনও যে দেখতে পেতে কীর্তনের মধ্যে এই শরীরটা গড়াগড়ি যাচ্ছে, কত কি শরীরটার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তাও কিন্তু ঠিক ঐ একই অবস্থা। সবটাই একই ভাব থেকে হয়ে যাচ্ছে।

❁ ❁ ❁

আবার যখন পূজা ইত্যাদি হত তখন যে দেবতার বা দেবীর পূজা হচ্ছে একেবারে ঠিক ঠিক সেই দেবদেবীর ভাব আসন মুদ্রা শক্তি ইত্যাদি সব কিছুই এই শরীরটায় সেইভাবে হয়ে যেত। কল্পনা করে নেওয়া তা কিন্তু নয় তোমরা যেমন প্রত্যক্ষ, ঠিক সেই রকমই। সব কিছু একেবারে সাজান। এই শরীরের থেকেই সব কিছুর প্রকাশ কিন্তু। দেবদেবীর মূর্তিকেও এই শরীর থেকেই বের করে নিয়ে বসিয়ে পূজা হল। আবার পূজা শেষ হলে এই শরীরটার ভিতরেই সব- যেখানে সেখানেই। সবই সম্ভব জেনো

❁ ❁ ❁

এই শরীরটা দিয়ে কি রকম সেবা হয়ে যেত জানিস। সেই রোগী যে আমি, যন্ত্রণাও যে আমি, সেবাও করছি আমিই। তাই যখন যেখানে যেটা দরকার ঠিক ঠিক হয়ে যেত। তোমরাও চেষ্টা করে যাও অন্ততঃ। নিজের মত করে প্রাণ দিয়ে সেবা করো। তাহলে সময়ে সব সেবাই প্রাণময় হবে।

❁ ❁ ❁

এই শরীরের ত গতিই এই। যখন যে দিকটা বলবে তখন সেই দৃষ্টিতেই সেই দিকটা বলে যাচ্ছে। তোমাদের মত সামঞ্জস্য দিয়ে ত সব সময়ে কথা বলা হয় না। সকলের সব ভাবগুলিই ত চোখের সামনে সর্বদা ভাসে।

❁ ❁ ❁

এই শরীরের কাছে একছাড়া ত দুই নাই-ই। অমৃতের সন্তান তাঁকেই ভাবতে হয়। তা' ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই, নাই, নাই- যাতে শান্তি হবে, আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে।

❁

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত।

সদ্‌গুরুর আশ্রিতের মুক্তি তিন জন্মে হয় কিনা

এরূপ ভাবে মায়ের সঙ্গে কোথাও যাওয়া আমার এই প্রথম। এত দীর্ঘ সময় মায়ের কাছে থাকিবার সুযোগ আর জীবনে হইবে কিনা কে জানে? নানা কথা হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, শুনিয়াছি যে সদ্‌ গুরু দীক্ষা দিলে দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যের সঞ্চিত কৰ্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়। প্রারব্ধ কৰ্ম্ম অবশ্য শিষ্যকে ভোগ করিতে হয়, কিন্তু উহার উগ্রতা গুরু অনেকটা কমাইয়া দেন। আর ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম অর্থাৎ শিষ্যের নূতন কৰ্ম্ম গুরু নিজে ভোগ করেন। ইহা যদি সত্য হয় তবে সদ্‌ গুরুর কৃপা প্রাপ্ত শিষ্যের মুক্তি লাভ করিতে তিন জন্ম লাগিবে কেন?

মা। কেহ বলেন যে তিন জন্মের মধ্যেই সদ্‌ গুরুর আশ্রিতের মুক্তি হয় আবার- কেহ বলেন যে দশ জন্মও লাগিতে পারে।

আমি। সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণের পর শিষ্য যে সব কৰ্ম্ম করে তাহার ফল ভোগ গুরু করেন কি?

মা কোন উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমি। তুমি কলিকাতায় বলিয়াছিলে যে কৰ্ম্ম করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় এবং যাহা করিতে ভাল লাগে এবং যাহা আবার করিতে ইচ্ছা হয় সেই সব কৰ্ম্মই ভোগের কারণ হয়।

মা। একথা আমি এখনও বলি। কৰ্ম্ম দুই প্রকারের হইতে পারে- কৰ্ম্মযোগ এবং কৰ্ম্মভোগ। নিষ্কাম কৰ্ম্ম করা, ভগবানের উদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করাকে কৰ্ম্মযোগ বলা যায় এবং যে কৰ্ম্ম দ্বারা শুধু ভোগ বাসনাই সৃষ্টি হয় তাহাকে কৰ্ম্মভোগ বলা যাইতে পারে।

আমি। সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষা পাইয়া যা ভোগাকাঙ্খা করিয়া কৰ্ম্ম করা যাইবে তাহার ফল কি গুরু ভোগ করেন? শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন যে সদ্‌গুরুর আশ্রিতের নূতন কৰ্ম্ম নাই। গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের করিয়া নেন। শিষ্য যে সাধনা করে প্রকৃতপক্ষে গুরুই উহা শিষ্য দেহে করিয়া থাকেন। এ জাতীয় কথা যে তুমিও না বলিয়াছ তাহা নয়। তুমি একদিন আমাকে বলিয়াছিলে যে সদ্‌গুরু আশ্রিত শিষ্য যদি অপকৰ্ম্মও করে তবুও জানিও তাহার উৰ্দ্ধগতি হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে সে নূতন কোন কৰ্ম্ম করে না।

মা। সদ্‌গুরুর আশ্রয় যদি সত্য সত্যই পাওয়া যায় তবে আর কথা কি? তিনি নিমেষেই শিষ্যকে মুক্তি দিয়া দিতে পারেন। আবার তিনিই শিষ্যকে দিয়া তাঁহার ভোগ বাসনা পূর্ণ করিয়া নেন। এরূপ কথাত তোমরা শুনিয়াছ যে গুরু নিজে শিষ্যকে ভোগের স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে ভোগ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ভোগক্ষয়ের লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছেন। যিনি সমস্ত কর্ম ক্ষয় করিতে পারেন তিনি কি আর প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ক্ষয় করিতে পারেন না? আবার গুরুর ইচ্ছায়ই শিষ্যের কৰ্ম্ম ক্ষয় হইতে কয়েক জন্ম লাগে, কেহ বলেন তিন জন্ম, কেহ বলেন দশ জন্ম।

"গুরু নিজে শিষ্যের ভোগ গ্রহণ করেন বা অন্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন বা ভোগ না করিয়া একেবারেই কাটাইয়া দেন এগুলি নানা ভাবের কথা। অবস্থা ভেদে নানা ভাব উপলব্ধি হয়। সাধনের অবস্থায় এমন ভাব আসে যখন মনে হয় ইহাই বুঝি সমগ্র সত্য। ভাবের বেগ এত বেশী হয় যে উহা আর গোপন করা যায় না। উহা যেন উপ্‌ছাইয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থা করিয়া যদি এক লক্ষ্য হইয়া পড়িয়া থাকা যায় তবে উহার উপরের অবস্থা লাভ হয় এবং তখন জানিতে পারা যায় যে পূৰ্ব্বের ভাবগুলির প্রকৃত অর্থ কি? মনে কর কেহ সাধন করিতে করিতে জানিতে পারিল যে তুমি তাহার পূৰ্ব্ব জন্মের ভাই ছিলে এবং জানিয়াই তোমাকে সেই কথা বলিয়া ফেলিল।

তোমার মধ্যেত সব কিছুই আছে। তুমি কেবল তাহার ভাই কেন, জন্মে জন্মে কত সহস্র সহস্র লোকের ভাই ছিলে। তাহা ছাড়া আরও কত কি সম্বন্ধ তোমার সহিত আর আর লোকের হইয়াছে, কিন্তু তাহার অনুভূতিতে সে সব কিছু আসিল না। সে শুধু তাহার পূর্ব্ব জন্মের ভাইরূপে তোমাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিল। সাধন জগতের অনুভূতিও সেইরূপ। একটা খণ্ড সত্যকে সাধক অনেক সময় পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তবে এক লক্ষ্য হইয়া পড়িয়া থাকিলে একদিন সে জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে- তখন আর কিছুই জানিবার বুঝিবার থাকে না।"

আমি। সদ্‌গুরুর আশ্রিতের মুক্তি পাইতে গুরুর ইচ্ছায় যদি দশ জন্ম লাগে তবে আবার গুরুর ইচ্ছায়ত অনন্ত জন্মও লাগিতে পারে?

মা। না, তাহা হইবে কেন? অনন্ত জন্ম ত আছেই। যদি একবার তাঁহার কৃপা পাওয়া গেল তখন অনন্ত জন্ম লাগিবে কেন?

এইভাবে নানা প্রসঙ্গ করিতে করিতে আমরা ট্রেনে যাইতে লাগিলাম। সময় যে কি ভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল তাহা আমাদের ধারাণায়ও আসিল না। এক এক স্টেশনে গাড়ী থামিতেছে আর সেখানকার ভক্তগণ ফুল মালা ফল ইত্যাদি লইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে গাড়ীতে আসিতেছেন। রাণীগঞ্জে পোষ্টমাষ্টার সুরেন্দ্র বন্দ্যোপোধ্যায় সস্ত্রীক আসিয়া দেখা করিলেন। সময় অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বেশীক্ষণ গাড়ীতে থাকিতে পারিবেন না। প্ল্যাটফর্মেই তাঁহারা দাঁড়াইয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা গাড়ী হইতে তাঁহাদিগকে জল ছিটাইয়া দিলেন। শান্তিবারি জ্ঞানে তাঁহারা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ঐ বারি গ্রহণ করিলেন। মা প্রসাদী ফলও ঐভাবে তাঁহাদিগকে ছুঁড়িয়া দিলেন। জসিডি, সীতারামপুর প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ ভক্ত সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের আনীত ফল সন্দেশ ইত্যাদি উপহার আমরাও বারবার প্রসাদরূপে পাইয়াছিলাম।রাত্রি একটু বেশী হইলে মা আমাদিগকে শয়নের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। আমরাও আমাদের ভিন্ন ভিন্ন আসনে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীরের সহিত মিশিয়া যাওয়ার অর্থ

স্বামী শঙ্করানন্দ - আচ্ছা, মিশিয়া যাওয়ার অর্থ কি? তোমার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার কথা বলিলে হয়ত তুমি উত্তরই দেবেনা। সেই জন্য সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে মিশিয়া যাওয়ার অর্থ কি?

মা- আচ্ছা, এই যে মিশিয়া যাওয়া বলিতেছ, নির্ম্মলবাবু প্রভৃতি অনেকেই আছে। তোমাদের দাদামহাশয়ের কথাই ধর না। যখন তোমাদের দাদামহাশয়ের মৃত্যু হয় তখন এ শরীর বর্দ্ধমান কিংবা কাশীর পথে গাড়ীতে ছিল। তখন দেখিতে পাইলাম যে কোন কিছু রাঁধিয়া উহা ঢালিয়া রাখিলে উহা হইতে যেরূপ ধোঁয়া উঠিতে থাকে সেইরূপ তোমাদের দাদামহাশয় সাদা ধোঁয়ার মত উঠিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশে মিশিয়া গেল। ইহার কিছু পরে দেখি যে তোমাদের দাদামহাশয়ের এক জ্যোতির্ম্ময় বেশ, নেংটি পরা, মাথায় একটা ফট্‌কা বাঁধা। ও গুলিও সাদা। পরে এ শরীরের সহিত মিশিয়া গেল। কোন অংশ বিশেষের সহিত মিশিয়া যাওয়া নয়। একেবারে সর্ব্বাংশের সহিত সর্ব্বাংশ মিশিয়া যাওয়া। এখন বলিতে পার যিনি যাঁহার সহিত মিশিয়া যান, তিনি তাহাই হন। যাঁহার সহিত মিশিয়া যান তিনি যদি কোন ধামের বা লোকের হন, তবে যিনি মিশিয়া যান তিনিও সেই ধাম বা লোক প্রাপ্ত হন, আবার যাঁহার সঙ্গে মিশিলেন তাঁহার যদি কোন বিশিষ্ট ধাম বা লোক না থাকে, তবে যিনি মিশিলেন তাঁহারও তাহা থাকিবে না। তোমাদের দাদামহাশয়ের এই শরীরটার সহিত যখন মিশিয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছি, তখন ইহা বুঝাই নাই যে এই শরীরের খণ্ড আকৃতির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ হইয়া আছেন।

আমি- মা, তুমি তোমার শরীরের সহিত দাদামহাশয়ের মিশিয়া যাওয়ার কথা যখন আমাকে বলিয়াছিলে তখন ঐ ধোঁয়ার কথা ত বল নাই। ঐই রূপ ধোঁয়া হওয়ার অর্থ কি ?

মা- ধোঁয়া হইয়া ঐ ভাবে ছড়াইয়া যাওয়া হইতে ঐ শরীরের একটা গতিই বুঝা গেল। পরে কিন্তু উহা আবার ঘনীভূত হইয়া একটা মূর্ত্তির আকার নিয়া এ শরীরের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

আমি- নির্ম্মলবাবু কি তোমার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন? এ কথাত পূর্ব্বে শুনি নাই।

মা- তুমি কি পর্য্যন্ত শুনিয়াছ?

আমি- শুনিয়াছি তিনি ঊর্দ্ধ লোকে গিয়া সেই লোকাধিপতির সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন এবং তিনি যখন তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন তাহার সহিত আরও মহাপুরুষ ছিলেন।

মা- হাঁ. তবে তাহার মিশিয়া যাওয়া একটু স্বতন্ত্র। এই মিশিয়া যাওয়ার মধ্যে একটু যেন অভাব আছে, ইহা সর্ব্বাংশে মিশিয়া যাওয়া নয়।

উৎসব-সূচী

১. গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব-১৯শে জুলাই, ২০১৬
২. শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর নির্বাণ তিথি-শ্রাবণ শুক্লাসপ্তমী- ১০ই আগষ্ট,২০১৬
৩. ঝুলন মহোৎসব- ১৩ই আগষ্ট হতে ১৮ই আগষ্ট, ২০১৬
৪. শ্রীভাইজীর (স্বামী মৌনানন্দপর্বত) এর নির্বাণ- তিথি ঝুলন দ্বাদশী- ১৫ই আগষ্ট, ২০১৬
৫. রাখী পূর্ণিমা- ১৮ই আগষ্ট, ২০১৬
৬. শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী- ২৫শে আগষ্ট, ২০১৬
৭. শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ মহাপারায়ণ- ৮ই সেপ্টেম্বর হতে ১৫ই সেপ্টেম্বের, ২০১৬
৮. শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির নির্বাণ তিথি ললিতাসপ্তমী- ৮ই সেপ্টেম্বের, ২০১৬
৯. শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গা পূজা- ৬ই অক্টোবর হতে ১১ই অক্টোবর, ২০১৬
১০. শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা-১৫ই অক্টোবর ২০১৬
১১. শ্রীশ্রীকালী পূজা- ২৯শে অক্টোবর, ২০১৬
১২. অন্নকূট- ৩১শে অক্টোবর, ২০১৬

গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

১৪-৪-১৯৭৭

যথারীতি মঙ্গল আরতি, উষাকীর্তন, গীতাপাঠ, ভজন কীর্তনাদি হইতে লাগিল।ষোড়শোপচার পূজা, রুদ্রাভিষেক হইল। মায়ের উপস্থিতি সকল স্থানেই। আজ মহানির্বাণী আখাড়ার প্রায় ১৭০ জন সাধুর সবস্ত্র ভাণ্ডরা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইল। হলে মা বসিয়া আছেন কীর্তনাদিও চলিতেছে। সাধুদের বস্ত্র, মালা দেওয়া হইল, আরতি করা হইল। সকলের সামনে মা গেলেন- "নমো নারায়ণ"- বলিলেন। বিকালের সৎসঙ্গ, সন্ধ্যায় গিরিজীর শিব মন্দিরে আরতি হইল।

১৫-৪-১৯৭৭

গিরিজীর উৎসব যথারীতি চলিতেছে। পূজা, পাঠ, আরতি, রুদ্রাভিষেক সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইতেছে। উৎসব মুখরিত দিনগুলি ভক্তদের আনন্দদান করিতেছে। আজ মা আশ্রমের সাধুদের নিয়া হরিদ্বারের ভাগবত ধামের মহন্তজীর আমন্ত্রণে সেখানে গেলেন।বিরাট প্যাণ্ডেল হইয়াছে। বিশেষ সমাদরে পূর্ণানন্দজী মাকে যথা স্থানে লইয়া গেলেন। প্রচুর লোক সমাগম হইয়াছে। সেখানকার ভক্তবৃন্দ বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত মাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। পূর্ণানন্দজী ভাষণ দেন এবং মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী ইহা ব্যক্ত করেন। মহামণ্ডলেশ্বর কৃষ্ণানন্দজী রামায়ণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর মাকে বিশেষ ভাবে বলা হয় একটু কিছু বলার জন্য। মা বলেন-" জ্ঞানস্বরূপ প্রেমস্বরূপ কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।" পূর্ণানন্দজী বলিলেন- বেদান্তের সারমর্ম মা একটি কথায় ব্যক্ত করিলেন। এবার সকলের অনুরোধে কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ নিজেই 'হে ভগবান' নাম শুরু করেন এবং মাও তাতে যোগদান করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। ফিরিয়া আসিয়া মা বলিলেন- "কত আদরে স্নেহে বাবা এত রোদ্দুরে এই ছোট্ট মেয়েটাকে গাড়ীতে তুলিতে আসিল। রাত্রি পর্য্যন্ত ভক্ত সমাগম চলিল মার কাছে।

১৬-৪-৭৭

খুব ভোরে মা উঠিলেন। খুব ভোরেই উত্তরকাশীর বাঙ্গালী সাধু স্বামী অখণ্ডানন্দজীর উত্তরকাশী যাওয়ার কথা ছিল। ছাদ থেকে মা তাঁকে দর্শন দিলেন। তিনি মোটরে নিতাইকে নিয়া উত্তরকাশী রওনা হইলেন। মা বলিলেন- "সাবধানে যেও।" আজ মায়ের শরীর একেবারেই ঠিক না থাকায় নীচে নামিলেন না। উপরের বারাণ্ডায় সকলে মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। গিরিজীর পূজা, আরতি রোজকার মত হইতেছে। লঘুরুদ্র ও হইতেছে।পণ্ডিতেরা ভোরে ফুল ফল নিয়া মায়ের নিকট রোজই আসেন। মাকে বন্দনা, আরতি করিয়া নিজেদের পূজায় বসেন।প্রতিদিন ১০৮ ঘিয়ের প্রদীপের আরতি গিরিজীর মন্দিরে হইতেছে। বিকালের সৎসঙ্গে প্রতিদিন নির্মল আখাড়ার স্বামী নারায়ণ সিংজী ভাগবতের উপর ভাষণ দিতেছেন আর পণ্ডিত ভগবান বল্লভজী রামায়ণের উপর ভাষণ দিতেছেন।

১৭-৪-৭৭

নিত্য নিয়মিত প্রোগ্রাম চলিতেছে। আজ মায়ের নৈমিষারণ্যে যাওয়ার দিন। আজ দুপুরে উদাসীন আখাড়ার সাধুদের সবস্ত্র মালা, চন্দন দক্ষিণাসহ ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। মা সকলকে দর্শন দেন। কীর্তন ভজনাদি ও সুন্দর ভাবে পরিবেশন করা হইতেছে। রাত্রি ৯-৩০টার সময় মা কতিপয় আশ্রমবাসী সহ নিমসার রওনা হইলেন। সেখানে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন পুরাণ পুরুষের উৎসব আছে এবং শোনা গেছে চেন্না রেড্ডি ওখানে মাকে দিয়া শিবমন্দির

প্রতিষ্ঠা করাইবেন। ২২শে ভোর বেলা মায়ের ফিরিবার কথা।

২১-৪-৭৭

খবর পাওয়া গেল মা নিমসারে একপ্রকার ভালই আছেন। ওখানকার উৎসব ও খুবভাল ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। এখানে ও পূজা পাঠ সৎসঙ্গ ভালভাবেই চলিতেছে। এই চারদিনে তেমন উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা নাই।

২২-৮-৭৭

আজ মা নিমসার হইতে আসিয়া পৌঁছাইলেন। গাড়ী তিন ঘন্টা লেট ছিল। যেখানে ভোর ৬টায় আসার কথা সেখানে আসিয়া পৌঁছাইলেন প্রায় ৯-৩০টার সময়। শুনিলাম রাত ১টা পর্য্যন্ত মা হরদোই স্টেশনেই বসিয়াছিলেন। পথে মা বাঘাট হাউস হইয়া আসিয়াছেন। শরীর একেবারেই ঠিক দেখাইতেছিল না। শিবমন্দির সমাধি মন্দির দর্শন করিয়া মা সোজা গাড়ীতে উঠিয়া হলে চলিয়া আসিলেন। এখানে আজ হইতে ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ হইতেছে। বৃন্দাবন হইতে নিত্যানন্দজীর ছেলে আসিয়াছেন ভাগবতের পাঠ ব্যাখ্যা করিতে। পূজা আরতি করিয়া মায়ের উপস্থিতিতে ভাগবত আরম্ভ হইল। প্রায় তখন ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। এরপর মা ঘরে আসিলেন বিশ্রামের জন্য। রোজ সকালে মূল পাঠ হইবে এবং বিকালে ৩টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ব্যাখ্যা হইবে। সাড়ে ৫টার সময় মা হলে গেলেন। আরতি করিয়া যথাসময় ভাগবত শেষ হইল। মা যেমন তেমন করিয়া বসিয়া আছেন। সকলের প্রণাম দর্শন হইল। নির্বাণী আখাড়ার মহন্তজী দুই টুকরী ফল মালা নিয়া মাকে শ্রদ্ধা জানাইতে আসিলেন। ১৭ই হইতে আজ পর্যন্ত ভগবান বল্লভজী রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন এবং নির্মল আখাড়ার মহন্তজী ভাগবতের উপর ভাষণ দিতেছিলেন। আজ মায়ের উপস্থিতিতে এসবের সমাপ্তির ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহাদের উপযুক্ত ভেট চড়ান হইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে নানা লোকের প্রাইভেট ইত্যাদি হওয়ার পরে মা প্রায় ১২টার সময় উপরে বিশ্রামে গেলেন।

২৩-৪-৭৭

যোগীভাইর মহাপ্রয়াণের ভাণ্ডারা

আজ মা ১০টার সময় সাধন আশ্রমে গেলেন। শুনিলাম সেখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। ওখান হইতে আসিয়া মা হলে বসিলেন। যোগী ভাইর মহাপ্রয়াণের জন্য আজ সাধু ভাণ্ডারা। নির্বাণী আখাড়ার মহন্তজীও আসিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে এক মহাত্মা আসিয়াছেন। তিনি কিছু সময় ভাষণ দিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য, বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দের কিছু কিছু কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন- " ইহারা সকলেই বলিয়াছেন যে জীব আর ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। শঙ্করাচার্য ভারতের চারিদিকে চারটি মঠ তৈয়ারী করিয়া ধর্মের প্রচার করেন- তেমন বুদ্ধও। বিবেকানন্দ ও বেদান্তের অমোঘ বাণী দিকে দিকে প্রচার করেন।তেমনি মায়ের প্রেরণায় ভক্তরা নানা স্থানে মঠ, মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। ধর্মের প্রচার হইতেছে এবং মাতৃমুখ হইতে সর্বদা বেদান্তের বাণী নি:সৃত হইতেছে।" বিকালে ভাগবত ব্যাখ্যা ৭টা পর্য্যন্ত চলিল। মা সাড়ে ৫টার সময় হলে আসিলেন। সন্ধ্যায় আরতি, শিব মন্দিরে মহিম্নস্তোত্র পাঠ হইল। ১০৮ খএর প্রদীপের আরতি হইল গিরিজীর মন্দিরে। আজ ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত দর্শন প্রাইভেট চলিল।

২৪.৪.১১

আজ রবিবার। গিরিজীর জন্ম হইয়াছিল কোন এক রবিবারে। কোন রবিবার সঠিক জানা না থাকায় মাসের প্রতি রবিবার কোন কিছু অনুষ্ঠান পালিত হইবে। আজ সাধু ভাণ্ডারার দিন। ভোরে মঙ্গল আরতি উষা কীর্তন হইল। হলে ৭টা হইতে ভাগবত আরম্ভ হইল। ১৩ তারিখ হইতেই ভোর ৬টা হইতে বিকাল ৬টা পর্য্যন্ত অখণ্ড জপ চলিতেছে গিরিজীর মন্দিরের পরিক্রমায়। প্রতিদিন দশোপচার পূজা হয় আর প্রতি রবিবার যোড়শোপচার পূজা

হইতেছে। মাও ভোরবেলায় গেলেন গিরিজীর মন্দিরে এবং গিরিজীকে মালা পরাইয়া প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তদের ভীড়তো সর্বত্র। আজ নিরঞ্জনী আখাড়ার মহন্ত মহারাজ সহ প্রায় ২০০ জন সাধু আসিলেন। মাও বসিয়া আছেন একদিকে অন্য দিকে সমস্ত সাধু এবং মহন্তজীরাও বসিয়াছেন। মহন্ত মহারাজ সামান্য একটু ভাষণ দিলেন- কেন তাঁহারা আজ মায়ের এখানে আসিয়াছেন। সুন্দরভাবে নাম হইতেছে। ভোলাগিরি আশ্রমের কয়েকজন সাধুও এই ভাণ্ডারায় যোগ দেন। চন্দন, মালা, বস্ত্র এবং দক্ষিণা সহ সাধুদের ভোজন পর্বে বসানো হইল। আমাদের ব্রহ্মচারীরা আরতি করিল। মা জোড় হস্তে সকলকে নমো নারায়ণ করিলেন। চারিদিক হইতে কীর্তনের আওয়াজ আসিতেছিল। পরিবেশটা মনোরম। এমনি ভাবে ভোজন পর্ব সমাধান হইল।

বিকালে মা সৎসঙ্গে গেলেন। ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছিল। জগৎগুরু আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী প্রকাশানন্দজী এবং নির্বাণী আখাড়ার মহন্তজী আজ ভাগবত পাঠে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশানন্দজী ভাষণ দিলেন এবং মায়ের উপস্থিতিতে তাঁহাদের দুজনকেই মাল্য, বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভেট দেওয়া হইল। ইহার পর গিরিজীর মন্দিরে নিত্যকার মত ১০৮ প্রদীপের আরতি, শিব মন্দিরে মহিম্নস্তোত্র পাঠ এবং কীর্তনাদির পর সমাপ্ত হয় অনুষ্ঠান। আজ সকালে ষোড়শোপচারে পূজা ও সম্পূর্ণ গীতাপাঠ হয়।

২৫-৪-৭৭ রামভাইয়ের ফার্মে

আজ ১০টার সময় রামভাইর ফার্মে মায়ের যাওয়ার কথা। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। ১০টায় মা সেখানের জন্য রওনা হইলেন। সঙ্গে সাধু ব্রহ্মচারিণী অনেকেই গেল। প্রায় ৩টার সময় মা ফিরিলেন শুনিলাম বেশ ভাল ভাবেই সেখানকার সব কাজ সমাধা হইয়াছে। রাত্রে মায়ের মুখে অনেক কথা শুনিলাম। বহু পূর্বে গঙ্গার উপরে দাক্ষিণাত্যের ঢংএর একটি শিব মন্দির ছিল সেখানে। এখনও তার চিহ্ন কিছু কিছু দেখা যায়। আবার কেউ কেউ বলে সেখানে নাকি সত্যনারায়ণের মন্দির ছিল। সেই দেবতাকে কেহ তুলিয়া নিয়া গিয়াছে।রামভাইর ফার্মের মধ্যে সে স্থান পড়িয়াছে, সেই স্থানেই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল। মা বলিলেন"পবিত্র স্থান।" এর পরেও মা অনেক কথা বলিলেন পরমানন্দস্বামীজী, মুক্তিবাবা এবং প্রবুদ্ধানন্দস্বামীর কথা। কেমন করিয়া পরমানন্দস্বামী মায়ের কাছে আসিলেন সেই গল্প শুনিতে সকলের খুবই ভাল লাগিল। অনেক রাত্রি হইল।

❀

তীর্থ দর্শন

-ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা

তীর্থ কৃপাকরলেই তীর্থ দর্শন সম্ভব হয়। অনেকদিন ধরেই শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শনের ইচ্ছা মনের মণি কোঠায় সযতনে সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু তা ঠাকুরের কৃপা সাপেক্ষ। অবশেষে ২৪শে জানুয়ারী, ২০১৬ নীলাচল এক্সপ্রেসে পুরী যাবার টিকিট হয়ে গেল। আমরা সকলেই খুব উৎসুকতার সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম যে কবে সেই দিনটি আসবে সেই ২৪শে জানুয়ারী। শেষে সেই শুভ দিন এসেই গেল। গাড়ীর সময় ছিল রাত ৮টা। কিন্তু হঠাৎ ঘন কুয়াশার জন্য ট্রেন ১০ ঘন্টা লেট হয়ে গেল। কিন্তু মায়ের কৃপায় মাতৃভক্ত গীতা আহুজাজী এগিয়ে এলেন আমাদের সহায়তার জন্য।রাত ২:৩০শে(আড়াইটায়) তিনটি গাড়ী নিয়ে এসে আমাদের স্টেশনে পৌঁছালেন। কিন্তু তখনও গাড়ী লেট ছিল। আমরা ওয়েটিংরুমে বসে ছিলাম। সে রাতে ভয়ংকর শীত ছিল। ভগবান ভক্তের পরীক্ষা নেন।ভোর ৫:৩০শে গাড়ী এল। গীতা আহুজাজী আমাদের গাড়ীতে বসিয়ে ফিরে গেলেন।

২৬শে জানুয়ারী ভোর ৩টায় আমরা পুরীধামে পৌঁছালাম। প্রায় ভোর ৪টায় স্বর্গদ্বারে মায়ের আশ্রমে পৌঁছালাম। স্টেশন থেকে আসার সময় সমুদ্র দর্শন হল। দূর থেকে উঁচু উঁচু সমুদ্রের ঢেউ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তখনও তমসাছন্ন সমুদ্র সুপ্ত বোধ হচ্ছিল। আশ্রমের অতিথি ভবন তখনও সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয়নি। আমরা আশ্রম ভবনেই রইলাম। আশ্রমের সেক্রেটারী গোলোকানন্দজী আমাদের তদারকি করছিলেন। আমাদের আশ্রমের পাণ্ডার সঙ্গে আমরা শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গেলাম। 'জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ" মনে মনে জপ করতে করতে সিংহদ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। লোক মুখে শুনে আমরা আনন্দিত হতাম আজ আমরা স্বয়ং সেই আনন্দের প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করছিলাম। এতদিনের অপূর্ণ স্বপ্ন আজ পূর্ণ হতে চলেছে আমরা নিজেরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমরা মন্দিরের আঙ্গিনায় বসলাম; পাণ্ডাঠাকুর আমাদের সংকল্প করালেন। তারপর আমাদের মন্দিরের গর্ভগৃহে নিয়ে গেলেন। আমাদের সামনে জগতের নাথ প্রভু জগন্নাথ বিরাজ করছেন। মধ্যে সুভদ্রা ও তাঁর পাশে বলরাম দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অশ্রুসজল নেত্রে ভাবতে লাগলাম-সত্যিই কি আমরা প্রভু জগন্নাথ দেবের সামনে দাঁড়িয়ে আছি! রত্নবেদী স্পর্শ করে আমরা দেব বিগ্রহের পরিক্রমা করলাম। প্রসাদ প্রাপ্তির পর শ্রী জগন্নাথ দেবকে হৃদয়ে স্মরণ করতে করতে আশ্রমে চলে এলাম। আবার ভোজনের পর একটু বিশ্রাম করে পুনরায় শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গেলাম। সেই সময় মন্দিরে ভোগ প্রবেশ করছিল। আমরা তা দর্শন করলাম। মন্দিরে ভোগ ঢোকার পরই আমরা মন্দিরে যেতে পারলাম। বিকালে আমরা গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে ভালভাবে ঠাকুর দর্শন করলাম। পরে আমরা ঠাকুরের কাছে গেলাম। খুব ভীড়। ঠাকুরের কি সুন্দর অপূর্ব শৃঙ্গার হয়েছে।মনোহর সাজে সজ্জিত ঠাকুরের দর্শনে মন পুলকিত হল। এই জড়ীভূত স্থূল নেত্রের দ্বারা প্রভুর সেই চিন্ময় বিগ্রহের সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপের ধারণা হৃদয়ে আমরা কিভাবে করতে পারব? তিনি যাকে কৃপা করে ধরা দেন তিনিই তাঁর যথার্থ দর্শন ও অবধারণ করতে পারেন। ইচ্ছা করছিল ঠাকুরকে হৃদয়ে জড়িয়ে ধরতে। মন চাইছিল পূর্ণরূপে ঠাকুরকে আপন করে নিতে। শ্রী জগন্নাথ দেব যেন নিজের বড় বড় চোখ দিয়ে নিজের অংশভূত জীবকে দেখে যেন আদর করে ডেকে ডেকে বলছেন 'ওগো আমার প্রিয় জীবগণ! আমি তোমাদের প্রাণসখা প্রাণের প্রাণ তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা আমার কাছে এসো এসো।" শ্রী ভগবানের এই প্রেমপূর্ণ আকর্ষণে সহৃদয় আহ্বানে আমরা এত অভিভূত হচ্ছিলাম যে ঠাকুরের সামনে থেকে সরতে মন চাইছিলনা। কিন্তু পুলিশের তাগাদাতে আমাদের অধীর মনে চলে আসতে হল। সেদিন রাতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ আমাদের আশ্রমে পাণ্ডা নিয়ে এল। মন্দিরের আঙ্গিনায় শ্রী শিবানন্দ আশ্রমের এক সাধুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি তাঁর পুরীতে অবস্থিত

আশ্রমে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। রাত্রিবেলা আমরা প্রভু জগন্নাথজীর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরে জানা গেল ২৭শে জানুয়ারী থেকেই মন্দিরের গর্ভগৃহে সর্ব সাধারণের জন্য প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেছে। কারণ সেই দিন থেকেই মন্দিরে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের সামনেই জীর্ণ সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে দূর হতেই দর্শনার্থী ও ভক্তগণকে প্রভু জগন্নাথের দর্শন করতে হবে। শোনা গেল রথযাত্রা পর্যন্ত মন্দিরের ভিতরের প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেছে। তাই পরে জ্যোতি ওদের কোলকাতা যাওয়ার পর সকলে ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা মন্দিরের ভিতরে কি ভাবে গেলে? মন্দিরতো বন্ধ হয়ে গেছে।" ওরা বলল যে আমরা ২৬শে জানুয়ারী মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে রত্নবেদী স্পর্শ করে শ্রী জগন্নাথ দেবের দর্শন করেছি। মাত্র একদিনের অন্তর। একদিন পরে নীলাচল ধামে এলে আর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে পারতাম না। সবই প্রভুর ইচ্ছা। মায়ের কৃপা।

২৭শে জানুয়ারী আমার দাদা এলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা সাক্ষী গোপাল দর্শনে গেলাম। প্রভু নিজের প্রিয় ভক্তের জন্য সাক্ষীরূপে আর্বিভূত হলেন। এক বৃদ্ধ এক যুবকের সঙ্গে বৃন্দাবন ভ্রমণে গেলেন। রাস্তায় বৃদ্ধ রোগে পীড়িত হলেন। যুবক খুব বৃদ্ধের সেবা করলেন। প্রসন্ন মনে বৃদ্ধ শ্রী গোপালজীকে সাক্ষী রেখে বললেন যে বিবাহের জন্য তোমায় আমি আমার কন্যা প্রদান করব। কিন্তু গ্রামে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধ সেই কথা ভুলে গেলেন। যখন যুবক বিবাহের জন্য বৃদ্ধার কাছে কন্যা চাইতে গেল তখন বৃদ্ধ তাকে তিরস্কৃত করে বললেন, "তোমায় যে আমি কন্যা দেব বলেছি তার সাক্ষী কে আছে?" যুবকটি ভক্ত ছিল। সে অন্তর হতে ভগবানকে ডাকল। তখন দয়াল ঠাকুর শ্রী ভগবান সেখানে সাক্ষীরূপে প্রকটিত হলেন। সেখানেই সাক্ষীগোপাল বিরাজমান রয়েছেন।ঠাকুর খুবই সুন্দর। কাছেই স্বর্ণময়ী রাধারাণী বিরাজ করছেন। কার্তিক মাসে রাধাষ্টমীর দিন প্রতিবছর এখানে পূজা হয়। "ধবলগিরি" যেখানে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পর রক্তরঞ্জিত যুদ্ধ পরিহার করে শান্তির পথ গ্রহণ করলেন। এখানে শান্তিস্তূপ নির্মিত হয়েছে। সেখানে গেলে সত্যিই শান্তির অনুভব হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম। ধবলগিরি থেকে আমরা ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শন করতে গেলাম। সেখানে দূর হতে শিবজীর দর্শন হয়। কিন্তু লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিল্পকলা দর্শন করে আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম। পাথরের কারুকার্য এবং মন্দিরে উঁচু শিখরে নির্মিত ছোট ছোট ভাবপূর্ণ সজীব মূর্তি দেখবার মত। পুরীর শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির ও শিল্প কলার দৃষ্টিতে অতুলনীয়। আমরা লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শন করে নন্দন কানন গেলাম। নন্দন কাননে অনেক চিতাবাঘ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সিংহ, হরিণ, জলহস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি দেখলাম। এখানে জন্তু জানোয়ারের ভাল সংগ্রহ রয়েছে। নন্দন কাননের সামনে একটি উঁচু ফোয়ারা রয়েছে। নন্দন কাননের পরে আমরা কোণার্কে সূর্যমন্দির দেখতে গেলাম। কোণার্কের সূর্যরথ বিশ্ববিখ্যাত। কোণার্ক থেকে পুরীতে আমাদের আশ্রমে আসতে রাত হয়ে গেল। শ্রী জগন্নাথজীর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ২৮শে জানুয়ারী আশ্রমের গোলকানন্দজী আমাদের মন্দির দর্শন করাতে নিয়ে গেলেন। সবার আগে আমরা "টোটা গোপীনাথ" পুরীর প্রখ্যাত বিগ্রহ দর্শন করতে গেলাম। ঠাকুর খুব সুন্দর। মন্দিরও খুব সুন্দর।

টোটা গোপীনাথ থেকে আমরা লোকনাথ মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের কাছেই একটি বিরাট পুকুর। শ্রী জগন্নাথ যেখানে লোকনাথ বাবা ও সেখানে। যুগ যুগ ধরে পুরাতন এই লোকনাথ শিবের মন্দির। শিবজী বিল্বপত্রে আবৃত থাকেন সারা বছর। বছরে একবার শিবরাত্রির আগের দিন শিবজীকে পরিষ্কার করা হয়।

এর পর আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দীক্ষাগুরু শ্রী তোতাপুরীজীর সমাধি দর্শন করতে গেলাম। তিনি

প্রায় ৩০০ বছর জীবিত ছিলেন। পুরীতে গভীর জঙ্গলে তিনি বাস করে তপস্যা করতেন। বাঘ ভালুকের মাঝে তিনি বাস করতেন।

তোতাপুরীজীর শান্ত নিস্তব্ধ সমাধি মন্দির হতে আমরা "আলারনাথ" এলাম। যখন প্রভু জগন্নাথদেবের জ্বর হয় তখন শ্রী জগন্নাথজী আলারনাথেই ভোগ গ্রহণ করেন। গুণ্ডিচা বাড়ীতে জ্বরের জন্য প্রভুকে পাচনের ভোগ দেওয়া হয়। অরুচির জন্য ভগবান এখানে এসে ভোগ গ্রহণ করেন। এখানে পায়েস ভোগ দেওয়া হয়। পায়েস খুবই স্বাদিষ্ট। এই জায়গার নাম "ব্রহ্মগিরি"। এখানে ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন। এখানে এক জায়গাতে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভাবাবস্থাতে একটি পাথরের উপরে পড়ে যান। সেখানে তাঁর প্রেমভাবে পাথর ও বিগলিত হয়ে কোমল হয়ে গিয়েছিল। তাই মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ শরীরের ছাপ ওই পাথরের উপড়ে দেখা যায়। আমরাও ওই পাথর স্পর্শ করে দর্শন করে প্রণাম করলাম। ভূমি হতে লক্ষ্মীদেবী এখানে প্রকটিত হয়েছিলেন। স্বয়ম্ভূ লক্ষ্মীদেবীর আমরা এখানে দর্শন করলাম।

শেষে জটিয়া বাবার মঠ দর্শন করতে গেলাম। এখানে প্রভুপাদবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী ও তাঁর শিষ্য শ্রী কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিজীর সমাধি রয়েছে। পাশে চন্দন পুকুর আছে।

সব দর্শন করে আমরা সোজা জগন্নাথজীর মন্দিরে চলে এলাম শ্রী জগন্নাথজীর দর্শন করে আমাদের এখানে ভোগ প্রসাদ গ্রহন করতে হবে। এখন ভীড় একটু কম থাকায় শ্রী জগন্নাথজীর দর্শন ভালোভাবে হল। পরে মন্দির - প্রাঙ্গনে বসে আমরা মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহন করলাম। তারপর আমরা কোলকাতা, বারাণসী ও আমার বাড়ীর জন্য মহাপ্রসাদ কিনে নিলাম। আমরা আনন্দ বাজারে গেলাম। আনন্দ বাজারে তো আনন্দই আনন্দ। ওখানে গিয়ে আমরা "তোরাণী" (লেবু, লঙ্কা, ওমিঠা নীমপাতা দিয়ে ফোড়ন দেওয়া স্বাদিষ্ট ভাতের ফেন) পান করলাম।

এরপর আমরা যেখান থেকে পতাকা উত্তোলন দেখা যাবে সেখানে গিয়ে বসলাম। পুরীতে শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রতিদিনই এই পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তিন জন পাণ্ডা কোমরে সমস্ত পতাকা নিয়ে পিঠ, হাত ও পায়ের সাহায্যে দর্শকের দিকে মুখ করে তর তর করে শিখরের উপরে উঠে গেলেন। একজনতো একেবারে চক্রের উপরে উঠে তার উপরে পতাকা উত্তোলন করলেন। দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন করলেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম এই দৃশ্য দেখে। আবার এই ভাবেই তাঁরা নীচে নেমে এলেন। আমরা বারে বারেই প্রভু জগন্নাথ কে দর্শন করতে মন্দিরে যাচ্ছিলাম। শেষে প্রভুকে প্রণাম করে উদাস মনে মন্দিরের বাইরে চলে এলাম।

প্রভু জগন্নাথ তো আমাদের হৃদয়ে চিরতরে বিরাজিত হয়েছেনই, কিন্তু পাণ্ডাদের কাছে গিয়ে গিয়ে হাত পেতে মহা প্রসাদ চাওয়া সারা জীবন মনে থাকবে। প্রভু জগন্নাথের জয় ও তাঁর মহা প্রসাদের জয়।

২৯শে জানুয়ারী জ্যোতি ও রশ্মি সকাল হতে সমুদ্রে স্নান করে খুব আনন্দিত হল। পরে আমরা কোলকাতা রওনা হলাম। স্বামী চিদানন্দজীর শিষ্যা গীতাঞ্জলীদি আমাদের সঙ্গে ছিল। "খুরদা রোড" স্টেশনে তাঁর জামাইবাবু আলুর পরোটা, আলুর তরকারী ও গাজরের হালুয়া নিয়ে এলেন যা খুবই স্বাদিষ্ট ছিল।

২৯শে জানুয়ারী রাত্রিতে প্রায় ৯টার সময় আমরা কোলকাতা পৌঁছালাম। স্টেশনে মাতৃভক্ত শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরদিন ৩০শে জানুয়ারী প্রাতে আমরা নবদ্বীপ ধামের দর্শনের জন্য রওনা হলাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ধাম। শ্রী শ্রী মায়ের নবদ্বীপ লীলা ও অমৃতময়ী। নাম ব্রহ্ম নাম সংকীর্তনের মহিমা অপার। আমরা শ্রী নবদ্বীপ ধামে দুপুরে পৌঁছালাম। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্যা শ্রী গৌরী মাতার দ্বারা স্থাপিত শ্রী সারদেশ্বরী আশ্রমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। প্রসাদ গ্রহণের পর প্রায় ৩টার সময়

অপরাহ্নে আমরা মন্দির দর্শনে বের হলাম। সবার আগে আমরা একটি বড় গৌড়ীয় মঠে গেলাম যেখানে রাধাগোবিন্দ এবং মহাপ্রভুর সুন্দর মূর্তি ছিল। মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কীর্তন আরম্ভ করলাম। তখন বিকালে ঠাকুরদের শয়ন উঠিয়ে মন্দির খোলা হয়েছিল। ভগবানের ফল প্রসাদ পূজারী আমাদের দিলেন। কীর্তন করতে করতে আমরা মন্দির পরিক্রমা করলাম। সেখান থেকে আমরা গোবিন্দ মন্দিরে গেলাম। কীর্তন করতে করতে ঠাকুরের দর্শন করলাম। তারপর বলভদ্র মন্দিরে গেলাম। সেখান থেকে আমরা আর এক গৌড়ীয় মঠে গেলাম। যেখানে সুন্দর ঠাকুর দর্শন হয়েছে। পাশে খুব বড় সরোবর। তার তীরে হরিণ, সারস, উঁট, হাঁস ইত্যাদি দেখলাম। সেখানে বিরাট অতিথি ভবনে সায়েবদের দেখলাম। সরোবরের মধ্যেও একটি সুন্দর মন্দির ছিল। অতিথি ভবনের পাশেই সুন্দর একটি শিব মন্দির ছিল। শিবলিঙ্গের খুব সুন্দর শৃঙ্গার ছিল। শিবজীকে তিলক লাগিয়ে সুন্দর সাজিয়েছিল। শেষে আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থানে গেলাম। এখানেই ১৪৮৬ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল। জন্মস্থানে নীম বৃক্ষের তলায় শ্রী জগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতার কোলে শ্রী নিমাইর শিশু মূর্তি বিরাজিত আছে। আমরা নীমবৃক্ষ স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। নীমবৃক্ষের কাছে ক্ষেত্রপাল শিব বিরাজমান। মন্দিরে শ্রী মহাপ্রভু, বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়া, রাধামাধব এবং পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ বিদ্যমান ছিল। আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম তখন এক পাঠক সেখানে পাঠ করছিলেন। কিছু শ্রোতা মনোযোগ সহকারে পাঠ শ্রবণ করছিলেন।

সন্ধ্যার সময় আমরা সারদেশ্বরী আশ্রমে ফিরে এলাম। তখন সেখানে মন্দিরে পাঠ, কীর্তন ইত্যাদি হচ্ছিল। আমরাও একটু কীতর্ন করলাম। কীর্তন খুব জমে ছিল। মন্দিরে আরতি, কীর্তন, শৃঙ্গার প্রভৃতি সব আশ্রমের মাতাজীরাই করেন। আশ্রমে দশজন মাতাজী ও দশটি ছোট কন্যা বাস করে।সৎসঙ্গ, কীর্তনের পর আমরা রাত্রিবেলা প্রসাদ গ্রহণ করলাম।

পরদিন ৩১শে জানুয়ারী প্রাতে আমরা আশ্রমের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরে উষা কীর্তন হল। তারপর এক মাতাজী পূজার আয়োজন করে পূজা করতে বসলেন। মন্দিরে সারদামার ছবি সুন্দর করে শাড়ী পরিয়ে সুসজ্জিত করে বিরাজিত করা হয়েছে। পাশেই নিতাই গৌরের মূর্তি মালা দিয়ে সাজানো ছিল। এর সঙ্গে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলভদ্রের সুন্দর মূর্তি ছিল। একটি বড় নারায়ণ শিলা ছিলেন। আশ্রমের মাতাজী নারায়ণ শিলাকে স্নান করিয়ে পূজা করছিলেন। এই নারায়ণ শিলা গৌরী মাতাজীর। ঠাকুর পরমহংস দেবের আদেশে এখানে ব্রহ্মচারিণী মাতাজীরাই নারায়ণ শিলা পূজা করেন।

বাইরে সুন্দর পুষ্পের উদ্যান। বাগানে নিতাই গৌরের সুন্দর মূর্তি। কাছেই শ্রী গৌরী মাতাজী, শ্রী দূর্গাপুরী মাতাজী এবং শ্রী কমলা মাতাজীর সমাধি আছে। আশ্রমের অন্যদিকে ধ্যানপীঠ রয়েছে। সেখানেও আমরা দর্শন করলাম। আশ্রমে গোশালাও আছে। শ্রী গৌরী মাতাজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন শ্রীশ্রী মা। গৌরীমা শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এসেছিলেন।

পূজার পর ফল প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা আবার মন্দির দর্শনে বের হলাম। আগে আমরা "ধামেশ্বর মহাপ্রভু" কে দর্শন করলাম।শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের পর বিরহকাতরা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর বিরহে অন্নজল ত্যাগ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বপ্নে মহাপ্রভু হতে নির্দেশ প্রাপ্ত করে নীমকাঠ দিয়ে মহাপ্রভুর বিগ্রহ নির্মাণ করলেন। শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দ্বারা সেবিত নীমকাঠের নির্মিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ খুবই সুন্দর। বিগ্রহ দর্শন করে মনে হল ঠাকুর যেন আমাদের বলছেন "তোমরা আমায় উঠিয়ে হৃদয়ে ধারণ কর" মন প্রসন্ন হল। মহাপ্রভুর চরণ পাদুকা আমাদের মস্তকে স্পর্শ করালেন পূজারিণী। আবার আমরা আর একটি মহাপ্রভুর মন্দিরে গেলাম। সেখান

থেকে শ্রীবাস অঙ্গনে গেলাম। সেখানে মহাপ্রভুর দ্বারা রোপিত বৃক্ষ আমরা স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। মহাপ্রভুর বিগ্রহের সঙ্গে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিগ্রহ তাঁর দুই পত্নী জাহ্নবী ও বসুধারার মূর্তি রয়েছে।

শ্রীবাস অঙ্গন থেকে আমরা 'সোনার গৌরাঙ্গ' গেলাম। সেখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সুন্দর মূর্তি। আমরা প্রায় সব জায়গাতে কীর্তন করছিলাম। আমরা ঠাকুরের পরিক্রমা করলাম। সোনার গৌরাঙ্গ থেকে আমরা ললিতা সখীর 'সমাজবাড়ী' গেলাম। আমরা খুব জমিয়ে কীর্তন করছিলাম। মন্দিরে তখন ভোগ হচ্ছিল। তিনটি মন্দির একই পংক্তিতে রয়েছে, শ্রীনিতাই গৌর, রাধা গোবিন্দ ইত্যাদি বিগ্রহ ছিল। ভোগের পর বৃদ্ধ পূজারীজী ওড়না মাথায় দিয়ে সখীভাবে আরতি করছিলেন। আরতির পর আমরা ললিতা সখীর গুরুদেবের মন্দির ও ললিতা সখীর ঘর দেখতে গেলাম। যেখানে ললিতা সখীর ছবি ছিল। সেখানে তাঁর গুরুদেবের মন্দিরে খুবই সুন্দর করে ভোগ সাজানো হয়েছিল। মায়ের আশ্রম হতে গিয়েছি শুনে পূজারীজী এক হাঁড়ি মোহনভোগ স্বপনদার হাতে দিলেন প্রসাদ রূপে।

আমরা প্রসাদ প্রাপ্ত করে প্রসন্ন মনে বেরিয়ে এলাম। ললিতা সখীর সঙ্গে মায়ের মধুর লীলা সম্বন্ধে আমরা পুস্তকে পাঠ করেছি। আজ প্রত্যক্ষ রূপে সেখানে পৌঁছে আমরা আনন্দিত হলাম। স্বপনদা পরে জানালেন যে স্বপনদার মনে হয়েছিল যে নবদ্বীপে মায়ের লীলা প্রত্যক্ষ করতে আসা কিন্তু তা তো কিছুই হল না। যেই তাঁর এই কথা মনে হয়েছে তৎক্ষণাৎ পূজারী তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনারা কত জন?" স্বপনদা বলতে তাঁর হাতে এক বিরাট হাঁড়ি ভরতি বড় বড় সাইজের মোহনভোগ দিলেন। যা আমরা তিন দিনে খেয়েও শেষ করতে পারলাম না। মায়ের লীলা সত্যিই অদ্ভুত।

আমরা সারদেশ্বরী আশ্রমের কাছে স্থিত "বুড়ো শিব" দর্শন করে সারদেশ্বরী আশ্রমে ফিরে এলাম। প্রসাদ গ্রহণের পর আমরা মাতাজী এবং কন্যাদের থাকার জায়গা পরিদর্শন করলাম। একটু বিশ্রামের পর নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম করে সারদেশ্বরী আশ্রম থেকে আমরা কোলকাতা রওনা হলাম। ২রা ফ্রেব্রুয়ারী আমরা দক্ষিণেশ্বর দর্শন করে আগরপাড়া আশ্রমে গেলাম নির্বাণদার সঙ্গে দেখা করতে। ৩রা ফ্রেব্রুয়ারী কালীঘাট দর্শন করে সুভাষ বসুর বাড়ী দেখতে গেলাম। সুভাষ বসুর ভাইপোর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু সেই সময় সেখানে এলেন দেখলাম। ৪ঠা ফ্রেব্রুয়ারী কোন্নগরে শঙ্করাচার্য শ্রী স্বরূপানন্দ সরস্বতীর দ্বারা স্থাপিত একটি খুব সুন্দর মন্দির দর্শন করলাম। মন্দিরে ত্রিপুরেশ্বরী দেবী-ললিতা মাতার সুন্দর বিগ্রহ। ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের নীচে কামেশ্বর শিব বিরাজিত রয়েছেন। মন্দিরের পরিবেশ খুব সুন্দর। মন্দির দর্শন করে স্বপনদা আমাদের চন্দননগর নিয়ে গেলেন। স্বামী নির্মলানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে। বিকালে আমরা বারাণসীর জন্য রওনা হলাম। স্টেশনে স্বপনদা এসেছিলেন আমাদের গাড়ীতে ওঠাতে। ৫ই ফেব্রুয়ারী আমরা বারাণসী পৌঁছালাম। আমিও কয়েক দিন পরে বাড়ী থেকে কন্যাপীঠে এসে পৌঁছালাম। সঙ্গে রইল তীর্থ দর্শনের মধুর স্মৃতি।

জয়মা।

কৌমারী রূপ সংস্থানে

-ব্রহ্মচারিণী জয়া

কুমারী কথাটির সঙ্গে আমরা বহুদিন ধরেই পরিচিত। বিশেষত: শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কুমারী তথা কিশোরী পূজনের একটি প্রথা বহুদিন ধরে প্রচলিত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বলা হয়েছে "কিশোরী পূজন কিশোরী ভজন কিশোরী করেছি সার।" আর তন্ত্র বা শাক্ত মতে বলা হয় কুমারী কুল কামিনীর পূজা। কেন এই কুমারী পূজা? বহুদিন ধরে প্রচলিত একটি প্রথা তাই কি এর একমাত্র কারণ না কি এর পশ্চাতে রয়েছে জগত সংসার সৃষ্টির পূর্ব সময়ের কথা। মা বলতেন "কুমারী মহাশক্তি। কুমারী সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হয়। কুমারী হল পবিত্রতা ও শক্তির পূর্ণ মূর্তি। যা থেকে সৃষ্টি , যা থেকে লয় তাই কুমারী। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই কুমারী। এইজন্য একে আদ্যাশক্তি এবং মহাশক্তি বলে। ইনি পবিত্র ও শুদ্ধ। এতে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের খেলা সম্ভব হচ্ছে। কুমারী বলতে যদি শক্তির পূর্ণ বিকাশ ধরে নেও তবে এই পূর্ণ বিকাশ বা প্রকাশ যে কোন বয়সেই হতে পারে। সেই হিসাবে বলা যায় কুমারীর কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই।"

দেবী স্বরূপা আত্মানন্দে স্থিতা কুমারী আদিশক্তি, তাই তিনি আদ্যা। চলমান জগৎ ও নিত্যগতি যুক্ত সংসারের অসার অবস্থাকে অনুভব করে সাধক সঘন সাধনাতে পূর্ণ লীন হন। সেই আদিশক্তির এক ক্ষুদ্রতম অংশে তারই পরিপূর্ণ ফলশ্রুতি এই কুমারী। শাস্ত্রে কুমারী পূজা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বৈদিক, পৌরাণিক ও তন্ত্র মতে একাকার রূপ দূর্গা পূজাতে কুমারী পূজা সম্ভবত তন্ত্র মতেই এসেছে। দেবী দূর্গা পরমানন্দ স্বরূপিণী। তিনি দেবী মহামায়া। তিনি একাধারে জগৎ সংসারের মোহবদ্ধ অবস্থার কারণ অন্যদিকে তিনি সাধকের সিদ্ধি দ্বার উন্মুমুক্ত করে পরব্রহ্মের সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকার হেতু।

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতাসনাতনী।
সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

শ্রীশ্রী চণ্ডী ১/৫৮

মেধা ঋষিকে সুরথ রাজা প্রশ্ন করেছিলেন কে এই আদিশক্তি, দেবী কুমারী? তাঁর জন্ম, উদ্ভব কি কারণে, কি ভাবে? তার উত্তরে মেধা ঋষি বলেন

"নিৈতব যা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদংততম্।

তিনি নিত্যা। জন্ম মৃত্যুরহিতা। তিনি দেবগণের কার্য সিদ্ধি তথা জগতের .উপকারের জন্য আবির্ভূতা হন মাত্র। এই জগতের সর্বত্র তিনিই বিদ্যমান। মহিষাসুর বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্রাদি সকল দেবগণের অঙ্গ তেজ থেকে তিনি প্রকাশিতা হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং সিদ্ধা দেবী চণ্ডিকা ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে বিল্ব বৃক্ষ মূলে ৮ বর্ষীয়া কুমারী কন্যা রূপে আবির্ভূতা হয়ে কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী নামধেয়া হয়েছিলেন।

"কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।"

দূর্গাপূজার অষ্টমীতে কুমারী পূজা হলেও মহানবমীতে কুমারী পূজার বিশেষ বিধান তন্ত্রসারে রয়েছে। পূজা, জপ, যজ্ঞ, কিছুই কুমারী পূজা ভিন্ন সম্পূর্ণ ফলদায়ী নয়। কুমারী পূজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোক তৃপ্ত হয়। জগন্মাতা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জননী হয়েও তিনি কুমারী। এই জন্য প্রত্যেক শক্তিপীঠেই কুমারী পূজার রীতি প্রচলিত রয়েছে। নেপালে কুমারী মায়েদের জন্য বিশেষ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। এক বৎসর কাল তাঁদের বিশেষ নিয়মে রাখা হয়। তারপর তাঁদের কুমারী পূজা করা হয়। দেবী পুরাণে বলা হয়েছে "কুমারীরূপধারীচ কুমারী জননী তথা কুমারী রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা।" দেবী ভাগবতে ও কুমারীপূজার

কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। শান্তি, বিদ্যা, রাজ্য, সুখ, বিজয়, শক্তি প্রভৃতি লাভ করার ইচ্ছায় নরগণ সর্বকামপ্রদা কল্যাণী কুমারীকে পূজা করবে। যিনি ধন লাভের ইচ্ছা করেন তিনি সপ্তবর্ষীয়া কুমারী পূজা করবেন। যিনি শত্রু ক্ষয়, আয়ু ও বলবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন তিনি দ্বিবর্ষীয়া কুমারীর পূজা করবেন। ত্রিবর্ষীয়া কুমারী পূজনে ত্রিবর্গ ফললাভ হয়। এই প্রকারে বহু কুমারীর কথা আমরা জানতে পারি।শুধুমাত্র তাই নয় ব্রাহ্মণের নিত্য সন্ধ্যার অন্যতম গায়ত্রী জপের পূর্বে দেবীর ধ্যানমন্ত্রেও কুমারীর ধ্যান করতে হয়।

"কুমারীং ঋকবেদযুতাংসূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্।" কুমারীর ধ্যান না কার গায়ত্রী জপ হয় না। দেবী গায়ত্রী প্রাতকালে কুমারী মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীরূপা ও সায়াহ্নে শিবরূপা। বিভিন্ন বয়স অনুসারে কুমারীর নাম ওবিভিন্ন হয়। এক বৎসরের কন্যা সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষীয়া সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিধামূর্তি। চতুর্থবর্ষীয়া কালিকা, পঞ্চম বর্ষীয়া সুভগা, ষষ্ঠ বর্ষীয়া উপমা, সপ্তম বর্ষীয়া মালিনী, অষ্টম বর্ষীয়া কুব্জিকা নবম বর্ষীয়া কালসন্দর্ভা দশম বর্ষীয়া অপরাজিতা একাদশ বর্ষীয়া রুদ্রাণী, দ্বাদশ বর্ষীয়া ভৈরবী, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া মহালক্ষ্মী, চতুর্দশ বর্ষীয়া পীঠনায়িকা পঞ্চদশ বর্ষীয়া ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোড়শ বর্ষীয়া অম্বিকা।

তবে এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় থেকে দশম বর্ষীয় কুমারী পূজার জন্য শ্রেষ্ঠ। সকলেই পূজা করতে পারে। কিন্তু এ সকল নিয়ম জাগতিক জীবের জন্য সাধকের জন্য হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন মাতৃভাব বড় শুদ্ধ। কুমারীর মধ্যে দেবী ভাবের প্রকাশ দেখা বা জননী রূপে পূজা করা সেই শুদ্ধ ভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ। দুর্গাপূজায় কুমারীর পূজার অনুষ্ঠান তারই শাস্ত্রীয় বাস্তবায়িত রূপ।

কুব্জিকা তন্ত্রে বলা হয়েছে যিনি কুমারীকে অন্ন, বস্ত্র, জল অর্পণ করেন তার অন্ন মেরুর তুল্য ও জল সমুদ্র তুল্য অক্ষয় হয়। অর্পণ করা বস্ত্র কোটি বর্ষ পর্যন্ত শিবলোকে পূজিত হয়। যে কুমারী পূজায় উপকরণ দেয়, দেবতা প্রসন্ন হয়ে তার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে "নার্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" অথাৎ যেখানে নারী বা কুমারী পূজা করা হয় সেখানে সমস্ত দেবতাগণ বিহার বা বাস করেন।

কুমারী পূজার ফল অবর্ণনীয়। সকলজাতির বালিকাকেই কুমারী রূপে পূজা করা যায়। কুমারী পূজাতে জাতি ভেদ নিষিদ্ধ। সর্বসুলক্ষণ যুক্তা কন্যাকে কুমারী রূপে পূজা করা উচিত। কুমারী পূজাতে মানুষ সন্মান, লক্ষ্মী, ধন, সম্পদ, বিদ্যা, মহান তেজ প্রাপ্ত হয়। তাঁর উপরে দশমহাবিদ্যা আর দেবতা প্রসন্ন হন এতে সন্দেহ নাই। ত্রিভুবন কুমারী পূজকের বশীভূত হয়। মহাভয়, দুর্ভিক্ষ আদি উৎপাত, দুঃস্বপ্ন,অপমৃত্যু এবং অন্য যা কিছু মানুষের দুঃখের কারণ তা সকল কুমারী পূজায় নষ্ট হয়। দুর্গাপূজাতে কুমারী পূজার সময় সংকল্প করতে গিয়ে বলা হয় "পরিপূর্ণফললাভকামকুমারীপূজাকর্মাহং করিষ্যামি।" অর্থাৎ এই মহান পূজায় পরিপূর্ণ ফল প্রাপ্তির জন্য কুমারী পূজা করছি। রুদ্রযাম তন্ত্রে বলেছেন "হোমাদিকং হি সকলং কুমারীপূজাং বিনা পরিপূর্ণং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ধ্রুবম্।" অর্থাৎ পূজা হোম প্রভৃতি সমদত কার্য কুমারী পূজা বিনা পরিপূর্ণ ফলদান করে না। আরও বলা হয়েছে "কুমারী পূজয়া দেবি ফলং কোটি গুণং ভবেৎ। পুষ্পং কুমার্য্যৈ যদ দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্ কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।" অর্থাৎ কুমারী পূজোর দ্বারা ঐ সকল কার্যের কোটিগুণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে একটি পুষ্প দান করলে সুমেরু দানের তুল্য ফল হয়। একটি কুমারীকে ভোজন করালে সমস্ত ত্রৈলোক্যকে ভোজন করানো হয়। বলা হয় পর্ব দিনে, পবিত্র দিনে মহানবমী তিথিতে কুমারীর পূজা করা উচিত। কুমারীকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়ে পায়ে আলতা কপালে সিন্দুরবিন্দু প্রদান করবে। এরপর চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রদান করে কুমারীকে আনন্দ সহকারে ভোজন করাবে। পূজার শেষে প্রদক্ষিণ করবে। কুমারীকে জপ সমর্পণাদি করে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। যে এরূপ প্রকারে কুমারীর পূজা করেন ভূত, বেতাল, গন্ধর্ব, যক্ষ,

রাক্ষস, দেবতা, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ভৈরবগণ, নিখিলব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব সকলেই তার উপর প্রীত হন। পূজান্তে তিনবার কুমারীকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এতে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের এক বিদ্যার্থী নেপালে থাকে তার শ্বশুর প্রতিদিনকুমারী পূজান্তে জল গ্রহণ করেন। আমি দশদিন তাঁর গৃহে বাস করে দেখে এসেছি। বহু নিষ্ঠাসহকারে তিনি পূজা করেন। আমাদের মাকেও দেখেছি কুমারী পূজান্তে কুমারী মায়ের থালা থেকে প্রসাদ গ্রহণ করতে।

প্রার্থনা করি মায়ের চরণে তিনি যেন আমাদের সকলকে ভগবদ্ভক্তি প্রদান করেন। তাঁরই আর্শীবাদে পরিপুষ্ট হয়ে এই শরীর দ্বারা তাঁর অনন্ত শক্তিস্বরূপা দেবী কুমারী মূর্তির অনন্ত মাহাত্ম্য লিখতে সচেষ্ট হয়েছি। জ্ঞান যাকে প্রকাশ করতে পারে না, বিদ্যা যাকে ধরে রাখতে পারে না, সেই অসীম পরাশক্তি কুমারী তাঁর অনন্য করুণায় এই হৃদয়াসনে বিরাজিত হোন। যেন তাঁর কৌমারী রূপের এক ক্ষুদ্রতম অংশে লীন হতে পারি।

জয় মা।

যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পেতে চেষ্টা। তাঁকেই ডাকা। তোমার সব কষ্টের কথা, আবেদন- নিবেদন যা কিছু, প্রাণ খুলে তাঁকে জানাও। তিনি পূর্ণ-কিনা, সবদিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব- দুঃখহারী। সর্বদাই তাঁর চরণে মনটা রাখা। তাঁরই ধ্যান, তাঁর কাছেই প্রার্থনা। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম। তিনি মঙ্গলময়, আনন্দময়, শান্তিময়। আর কি নয়? তিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মা।

-শ্রীশ্রীমা

প্রার্থনার শক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাস

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার মাণ্ডলে আজ খুব খুশী ছিলেন। খুশী হওয়ার কারণ ও তেমনিই ছিল। সম্প্রতি তাঁকে তাঁর গবেষিত- প্রবন্ধের জন্য প্রতিষ্ঠা পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।

সেই সমারোহে উপস্থিতির জন্য বিমান যোগে দিল্লী রওয়ানা হবার জন্য বের হলেন। ডাক্তার মাণ্ডলে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তার গবেষিত প্রবন্ধের জন্য তাঁকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। দিন রাত তিনি সংশোধনে মগ্ন থাকতেন। অনেক চিন্তা তাঁর মনে এসে ভিড় করছিল। হঠাৎ বিমান কে আপৎকালীন ল্যাণ্ডিং করতে হল। ড: মাণ্ডলে সমারোহে যথাসময়ে পৌঁছানর জন্য চিন্তান্বিত হলেন। এয়ার পোর্টের অধিকারী তাঁকে জানালেন যে আগামী ফ্লাইট ১০ ঘন্টা পরে আছে। তাই ডাক্তার মাণ্ডলে ভাড়া গাড়ীতে (ট্যাক্সীতে) দিল্লী যাওয়া ঠিক করলেন। প্রায় সেখান থেকে ৫-৬ঘন্টার রাস্তা ছিল। অন্য কোন বিকল্প না থাকায় তিনি ট্যাক্সী করেই রওনা হলেন তবে এক ঘন্টাও অতিবাহিত হয়নি হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে লাগল। আর খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হল। রাস্তার সাইন বোর্ড ভাল করে দেখা যাচ্ছিলনা। বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে যাবার পর তাঁর মনে হল তিনি রাস্তা ভুল করে ফেলেছেন। বৃষ্টির বেগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এখন কোন আশ্রয় খুঁজবার প্রয়োজন বোধ হল। ভগবানের দয়ায় একটু দূরেই একটা বাড়ী দেখা গেল। সেখানে পৌঁছে তিনি দরজার কড়া নাড়লেন। একটি মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন ও তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে আসতে বললেন। তাঁর ঘর অতি সাধারণ ছিল। জিনিস পত্র অতি স্বল্প ছিল, মূল্যবান জিনিস ইত্যাদি কিছুই ছিল না। সেই মহিলাটি ডাক্তারের জন্য চা ও বিস্কুট এনে দিলেন এবং তাঁকে বললেন- "আমার প্রার্থনার সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি কি আমার সঙ্গে প্রার্থনা করবেন?"

ডাক্তার মাণ্ডলে শুধু কর্মযোগে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শিষ্টতার সঙ্গে নিষেধ করে দিলেন। মহিলাটি উঠলেন, তিনি ভগবানের মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রাথর্না করতে লাগলেন। প্রার্থনার মাঝে প্রতিটি বিরতির মধ্যে সেখানে রাখা একটি ছোট দোলনা দোলাচ্ছিলেন। ডাক্তার তাঁর ক্রিয়াকলাপ মন দিয়ে দেখছিলেন তাঁর মনে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করার জন্য অনেক প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর প্রার্থনা শেষ হল। ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- ১. এই সব প্রার্থনার কোনও উপযোগিতা আছে কি? ২. ভগবান তোমার প্রার্থনা কখনও শুনেছেন কি? ৩. আর তুমি এই দোলনা বারবার দোলাচ্ছিলে কেন?" সেই মহিলাটির মুখে হঠাৎ দু:খের আভাস দেখা গেল। তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে বললেন-

"আমার দুই বছরের পুত্রের জন্ম থেকেই হৃদয় রোগ। বম্বের প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাণ্ডলে ছাড়া আর কেউ ওর চিকিৎসা করতে পারবে না। কিন্তু তাঁর কাছে যাবার আমার কাছে পয়সা নেই। আমি রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে কোনও প্রকারে আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দাও এবং আমার পুত্রের জীবন দান দাও এবং আমার বিশ্বাস একদিন ভগবান নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন।"

এরপর কিছুক্ষণ চতুর্দিকে নি:শব্দ পরিবেশের সৃষ্টি হল। ডাক্তার মাণ্ডলে একদম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কি বলবেন- তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঘটিত ঘটনাবলীর বিষয়ে তিনি চিন্তা করতে

(শেষাংশ ১৮ নং পৃষ্ঠায়)

শ্রীশ্রী নির্মলানন্দময়ী গীতা*

পূর্বভাগঃ

নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে

প্রথম খণ্ডঃ

(দেহধারিণী মাতা নির্মলানন্দময়ী)

- শ্রীগণেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(১)

দেহধারিণী শিবদা,
জন্মকালে তু শব্দহীনা,
শৈশবে স্তিমিতা সদা
কালং হি যাপয়ামাস মুদিতা।
স্তনপায়িনী নির্মলা
সরূপা নারায়ণী শুভা,
অতিষ্ঠদ্ভাবাকুলা,
জীবভাববিহীনা ধ্যানলগ্না।
দুরভিজ্ঞেয়া খলু সা
বৃদ্ধিমগচ্ছদপরিজ্ঞেয়া,
সর্বৈরবিদিতাপি সা
সুখেন কালমযাপয়ন্নির্মলা।

বঙ্গানুবাদ-মাতা নির্মলা কল্যাণ প্রদায়িনী দেহধারণ করে এই ধরা ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।জন্মের সময় তিনি অন্য শিশুদের মত রোদন করেন নি। শৈশবে তিনি সর্বদাই কি এক অপরূপ ভাবে বিভোর হয়ে আনন্দে থাকতেন। শিশু নির্মলা সাকার রূপে নারায়ণ স্বরূপা আবার মঙ্গলময়ী নারায়ণী রূপে প্রকটিতা। জীবভাবের অতীতে বিরাজিতা সদা স্বভাবে অর্থাৎ (আত্মভাবে সংস্থিতা) ধ্যানে- নিজ স্বরূপের ধ্যানে সদানিরতা। রহস্যময়ী সহজে ধরা দেন না। বহু সাধনার দ্বারাও তাঁকে জানা যায় না। তিনি যদি কৃপা করেন তবেই তাঁকে জানা যায়। লোকলোচনের অন্তরালে শিশু নির্মলা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। সকলের অলক্ষ্যেও অতি আনন্দে তাঁর সময় ব্যাতীত হতে লাগল।

---

* শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রীগণেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত সংস্কৃতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাবলী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তখন শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই এই লঘু পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সেই কৃতি পাঠকদের জন্য বঙ্গানুবাদ সহ অমৃত বার্তাতে প্রকাশিত করা হচ্ছে।

(২)

দিনেষু গচ্ছৎ হিসা
বর্দ্ধয়ামাস নিত্যমুক্তা,
অশনবসনে বিমনস্কা
ভাববিহ্বলা তু ভবভাবহীনা।
বিষয়বোধরহিতা সা
দেবী ভাবগতা নির্মলা,
অবোধেতি বিবেচিতা
সুখেন কালময়াপয়দনাকুলা।
বন্দেতাম্ অবিকৃতাং
শক্তিরূপাং নিত্যমুক্তাং,
বন্দে তাং ভবহরাং
ভবতাপনাশিনীমতিপূতাম্।

বঙ্গানুবাদ- নিত্যমুক্তা নির্মলা দিনে দিনে বড় হতে লাগলেন। খাওয়া পরাতে অন্যমনস্কা। আত্মভাবে সদাই বিভোর, কিন্তু সাংসারিক ভাবের লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই। সাংসারিক বিষয়বোধ তাঁর মধ্যে বিন্দু মাত্রও নেই। নির্মলা দেবীর ভাবে পরিপুর্ণা কারণ তিনি যে স্বয়ং দেবী ভগবতী। সাংসারিক বিষয়বোধ না থাকার জন্য তাঁকে অনেকে অবোধ মনে করতেন। কিন্তু বালিকা নির্মলা অবিচলিত চিত্তে আনন্দে দিনাতিপাত (দিন যাপন) করতেন। সেই অবিকৃত অবস্থায় স্থিতা অর্থাৎ যিনি মূল স্বরূপে অবস্থিতা সেই শক্তিস্বরূপিনী নিত্যমুক্তা মাতাকে প্রণাম করি বন্দনা করি। যাঁর কৃপাতে সংসারে আসা যাওয়া চিরতরে বন্ধ হয়, সংসারের সকল প্রকারের তাপ যিনি নাশ করেন। সেই অতিপবিত্র মাতা নির্মলাকে প্রণাম করি।

"প্রার্থনার শক্তি ও ঈশ্বরের বিশ্বাস" গল্পটির শেষাংশ

লাগলেন। কোন প্রকারের পূর্বাভাস ছাড়াই আবহাওয়ার হঠাৎ খারাপ হওয়া, বিমানের আপৎকালীন ল্যাণ্ডিং, ট্যাক্সি দ্বারা রাস্তা বিভ্রাট পথ ভুলে যাওয়া আর এই বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেওয়া। আর এখন এই মহিলাটির দ্বারা কথিত বাস্তবিক স্থিতি! কি অদ্ভুত! কি চমৎকার!

কিছুক্ষর পরে ডাক্তার মাগুলে মহিলাকে নিজের পরিচয় দিলেন ও বৃষ্টি বন্ধ হলে সেই মহিলা ও তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে তিনি বম্বে রওনা হলেন এবং সঙ্গে নিলেন ভগবানের উপর অপার নিষ্ঠা!

যে কোন পুরস্কারের থেকে তাঁর আজ অনেক বেশী প্রাপ্তি হয়েছিল।

(কল্যাণ হতে উদ্ধৃত)

জীবন দর্শন

বলি অসুরদের পরম ঐশ্বর্যশালী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যে বিনা চাষে ভূমি ফসল উৎপন্ন করত। নদীর জল কখনও শুকাতো না। এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে দিক দিয়ে রাজা হেঁটে যেতেন, লোকেরা সেই দিকের উদ্দেশ্যে অবনত মস্তকে প্রণাম জানাতেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই দুর্দৈব বশতঃ তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হলেন। জীবনের এই সময়টা তিনি অজ্ঞাত বাসে ব্যতীত করতে লাগলেন। এই সময়ে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে গেলেন। যখন তাঁরা দুজনে কথোপকথনে রত ছিলেন সেই সময় বলি রাজার শরীর হতে পরম দীপ্তি সম্পন্না মা লক্ষ্মী প্রকট হলেন আর দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন- "দেবরাজ, আমার চারটি চরণ, যে রাষ্ট্র আমার এই চারটি চরণকে স্থির আধার প্রদান করতে পারে, সেই রাষ্ট্রেই আমি স্থায়ীরূপে বাস করে থাকি। বলি আমাকে স্থির আধার দিতে পারি নি, তাই আমি তার রাজ্যপরিত্যাগ করেছি, এখন আমি তোমার রাষ্ট্রে আসতে চাই, বল আমার প্রত্যেক চরণ কোথায় কোথায় প্রতিষ্ঠিত করবে।" "শুভে, আপনার প্রথম চরণ এই ভূমিতে রাখুন, যে ভূমিকে আমার স্বেদের দ্বারা (পরিশ্রমের দ্বারা) রাষ্ট্রধাত্রী অন্নপূর্ণাস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় চরণ এই জলরাশির উপরে রাখুন, যা আমার বুদ্ধি বলের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে অমৃতের মত জীবন দাতা হয়ে গেছে। তৃতীয় চরণ আপনি অগ্নির উপরে রাখুন, যা রাষ্ট্রের জনশক্তি,যার পূর্ণরূপে উপযোগ আমি রাষ্ট্রের উৎকর্ষের জন্য করছি আর চতুর্থ চরণ রাখুন আমার প্রজার উপরে, যারা পরাক্রমী, দানী ও সদাচারী রূপে খ্যাত।" ইন্দ্রের এই আমন্ত্রণে লক্ষ্মী গদ গদ হয়ে গেলেন আর বরদ হস্ত উঠিয়ে বললেন- "দেবরাজ, বলির রাজত্বে শুধু তিনটিই চরণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, চতুর্থটি ছিল না, তাই আমাকে সেখান থেকে পলায়ন করতে হয়েছে। যখন কোন রাজ্যে প্রজা সদাচার হারিয়ে ফেলে, তো সেই রাজ্যের ভূমি, জল ও অগ্নি কেউই আমাকে স্থির রাখতে পারে না। আমি রাজ্যশ্রী ও লোক-শ্রী, আমার লোক সিংহাসন চাই। ব্যক্তির সদাচারী মানসেই আমি অচলা হয়ে নিবাস করি।"

(দৈনিক ভাস্কর পত্রিকা হতে উদ্ধৃত)

❀

ভাঙাহাল-ছেঁড়া পাল

- শ্রী মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী

দিন আর চলে না মাগো, কি করি উপায়,
অকাজে কুকাজে হায় আয়ু ক্ষয়ে যায়।
অভাবের তাড়নায় নীচু হয় মন
নেই নেই হাহাকার-মন উচাটন।
দয়া কি হবে না হায় এ জনমে আর!
দেখা দাও, সাড়া দাও, বড়ই আঁধার।
আরবার ক্ষমা কর, ধরি রাঙা পায়।
মুখ তোল, ফিরে চাও, পড়েছি ধূলায়।
নাকে খৎ এই নাও, আর হবে না।
চুমো খেয়ে কোলে নাও, আর পারি না।
সংসার করা তো হল-ছোটাছুটি সার।
ক্লান্ত বড়, বসতে দাও চরণে তোমার।
শিথিল ইন্দ্রিয় সব, নামেই আমার।
দিনে দিনে দেখা দিয়ো, নামিছে আঁধার।
দু:খের পরেতে সবে সুখ আসে বলে।
ধিক্ ধিক শতধিক, এ পোড়া কপালে।
যাদের দিয়েছো মাগো সাথেতে আমার
বহিতে শক্তি নাই তোমার সে ভার।
ভাঙা হাল, ছেঁড়া পাল, জরাজীর্ণ তরী।
স্বখাত সলিলে হায় ডুবে আমি মরি।
ক্ষমা ছাড়া এ পাপীর গতি নাহি হবে
মা বিনা সন্তানের ব্যথা কেহ না বুঝিবে।
সংসারের চাকুরিতে বড় অবসাদ।
তোমারই কাননের মালী হতে সাধ।

পাদপীঠম্ স্মরামি

শ্রীশ্রী মা ও বিন্ধ্যাচল আশ্রম

-ব্রহ্মচারিণী গীতা

কন্যাপীঠের কন্যাদের প্রতি মায়ের বাণী-

কন্যাপীঠের আদিকন্যা ভক্তিপ্রিয়া ও শান্তিপ্রিয়া মায়ের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। একদিন গুরুপ্রিয়াদি এই দুই কন্যাকে দেখিয়ে কাউকে বললেন, "এরা মা বাবা ছেড়ে আশ্রমে এসেছে।" অমনি মা হেসে বললেন, "মা বাবা ছেড়ে কোথায় এসেছে? মা বাবা পেতে এসেছে।" বাস্তবিক যর্থাথ মা বাবাতো একমাত্র ভগবানই। তিনি মা বাবার ও মা বাবা। পরম পিতা পরম মাতা একমাত্র ভগবানই।

বিন্ধ্যাচলে মায়ের উপস্থিতিতে সরস্বতী পূজা হয়। প্রতিমা কাশী হতে আনা হয়। এই পূজাতে সাধন সমর আশ্রমের শ্রী অতুল ঠাকুর এলেন। তিনি পরদিন সকলের সঙ্গে সমবেত ভাবে সূর্যের অর্ঘ্য দেন এবং মায়ের পূজা করেন।

বিন্ধ্যাচলে স্বামী শংকরানন্দজীর শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত গীতা শ্রবণ :-

বিন্ধ্যাচলে একদিন মা ছোট ঘরটির বারান্দায় বসা। সন্ধ্যা বেলায় স্বামী শঙ্করানন্দজী মাকে প্রার্থনা করলেন, "মা একদিন গীতা শুনিয়েছিলে, আজ আবার শোনাও।" নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ের পরিবেশ। জ্যোৎস্নাধারায় অবিরত চতুর্দিক প্লাবিত হচ্ছে। পাহাড়ের দৃশ্য অতি মনোরম। কিছুপরে মার শ্রীমুখ থেকে সুন্দর সুরে ধীরে ধীরে স্তোত্রের মত নিঃসৃত হতে লাগল। মা দুলে দুলে গানের সুরে ওই সব বলছেন। প্রায় ১ ঘন্টা পর্যন্ত ওই ভাবে হল। সকলেই শুনে আনন্দিত হলেন। এই বিন্ধ্যাচলেই আরেকদিন সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর বসে মা কথায় কথায় বলেছিলেন, "গীতা শুনবে?" এই বলে কি এক অপূর্ব সুরে মা কিছুক্ষণ শুনিয়েছিলেন। সেই ভাষা কেউ বুঝতে না পারলেও খুব মিষ্টি লেগেছিল। শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মার এই স্তব স্তোত্রের ভাষা শুনে বলেছিলেন যে এই ভাষা অলৌকিক বৈদিক ভাষা। এ সাধারণের বোধগম্য নয়।

শ্রীশ্রীমাকে জনৈক ভক্তের ষোড়শীভূবনেশ্বরীরূপে দর্শন-

কোলকাতার আশুতোষ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল শ্রদ্ধেয় কালীদাস সেন মহাশয় বায়ু পরিবর্তনের জন্য বিন্ধ্যাচলে এসেছেন। সেটা ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাস। মা তখন বিন্ধ্যাচলে। তাই শ্রী সেন মার দর্শনের জন্য এলেন। ইতিপুর্বে ইনি ২/৩ বার মার দর্শন করেছেন। এখানেই এর মার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ইনি এসে গুরুপ্রিয়াদিদিকে বললেন, "আমি প্রথম দিন এসে মাকে দেখি, মা সে সময় উপরের এই ঘরটিতে শুয়েছিলেন। দেখলাম যেন কোটিচন্দ্রের জ্যোতি মার মুখে। আমার বাবা দশমহাবিদ্যার ছবি এনেছিলেন। আমার মনে পড়ল, আমি পরিষ্কার দেখলাম ষোড়শী ভুবনেশ্বরী মূর্তি। এমন পরিষ্কার দেখলাম কি বলব। তখন মনে হল চরণ দর্শন হল না। আরও একদিন এসেছিলাম, সেদিনও চরণ দর্শন হল না। আমি কিছুই বলিনি। মার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা ও হয়নি। গতকাল মা যে আমাদের ওইদিকে বেড়াতে গেলেন ওই বেড়ানো কিছুই নয়। আমি বেশ বুঝেছি মা আমাকে চরণ দর্শন করাতে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম চরণে কোটি পদ্ম। আমি দেখে কৃতার্থ হলাম।" মা অমনি বলে উঠলেন, "বাবা মেয়েটাকে এইরকম বলে না।" তিনি হাত জোড় করে বললেন, "মা আপনাকে চিনেছি। অমনি দুষ্টামি করলে কি হবে?" মা অমনি খল খল করে হেসে বললেন, "বাবা নিজের মেয়েটাকে চিনবেনা?" তিনিও হেসে বললেন, "তা মা যত গালাগালি দিন, আমি আপনাকে চিনেছি।" মা হেসে বললেন,

" বাবার স্বভাবই ত মেয়েটা পেয়েছে।" ওই ভদ্রলোক ভুবনেশ্বরী রূপে মাকে দর্শন করে ধন্য হলেন।

মাতৃ নির্দেশে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে কিছুদিন গুরুপ্রিয়াদিদি বিন্ধ্যাচলের যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ করেছিলেন। ১৯৪১ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে মায়ের জন্মদিন থেকে জন্মতিথি পর্যন্ত মায়ের শরীরের সুস্থতার জন্য বিন্ধ্যাচলের যজ্ঞ কুণ্ডে এক লক্ষ আহুতি অর্পণ করা হয়।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমের গুহাতে মৌনীমার অপূর্ব অনুভূতি-

একবার বিশিষ্টা সাধিকা মৌনীমা মার সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে ছিলেন। মৌনীমা একদিন আশ্রমের নীচের গুহায় সাধন ভজন করতে বসেছেন। সেখানে তাঁর সুন্দর অনুভব হল। তিনি মাকে বললেন, "গুহাটি অতি চমৎকার জায়গা। গুহার মধ্যে বসা মাত্রই আমার শরীর যেন পাথরের মত হয়ে গেল। তারপর ওখানে যে তোমার পাদপীঠ রাখা আছে সেটা আমি আগে দেখিনি। কিন্তু একটু পরেই পাদপদ্মটি সুন্দর জ্বল জ্বল করে চোখের সামনে ফুটে উঠল। তারপর দেখলাম তুমি যেন আমার পাশে গিয়ে বলছো- "আর কাশী যেওনা।" মৌনীমার বেশ উন্নত অবস্থা ছিল। বিন্ধ্যাচলের আশ্রমের গুহাতে একটি সুন্দর পরিবেশ অনুভূত হয়। এখন ওই গুহাতে একটি ছোট শিব ও মার পাদপীঠ স্থাপিত আছে।

শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪২ সালে বিন্ধ্যাচলে। এই বিন্ধ্যাচলেই শ্রী প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী মাতৃসান্নিধ্যে আসেন ১৯৪৩ সালে। প্রভুদত্তজী মাকে সর্বপ্রথম সাধু সমাজের সামনে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্রীগুরু ও ইষ্টের মিলনভূমি-

বিন্ধ্যাচল আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন মায়ের স্বয়ং দীক্ষার উৎসব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষার খেলা আপনা আপনি হয়েছিল, তাই এইদিন সকাল বেলা বিন্ধ্যাচল আশ্রমের যজ্ঞকুণ্ডে একলক্ষ আহুতি দেওয়া হল। দুপুরে মায়ের ভোগ ও তিনটি কুমারী পূজা করা হল। পূজার সময় মা বসেছিলেন। ভক্তরাও বসেছিলেন। পূজার পর আরতির সময় ভক্তরা কীর্তন করতে লাগলেন। কি একটা আনন্দের সাড়া পেয়ে তাঁরা যেন বিভোর হয়ে কীর্তন করছিলেন। আরতি শেষ হলে পূজকেরা যখন কুমারীদের প্রণাম করছিলেন তখন মা কুমারীদের লক্ষ্য করে বললেন,"তোমরা এদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর এবং বল 'মঙ্গল হোক'। গুরুপ্রিয়াদিদি তখন মাকে বললেন, "বেশতো এখন আমরা তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে যা হয় বল।" দিদির কথায় সকলেই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সকলেই মাকে প্রণাম করতে লাগলেন। মা হেসে দিদিকে বললেন,"তুই আবার এই কি আরম্ভ করলি? যাক খুকুনী বলেছে আমিও তাই করি" এই বলে মা সকলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে লাগলেন "মঙ্গল হোক"। ভক্তদের মধ্যে প্রণাম করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মা কখনও কখনও নিজের মাথায় হাত দিচ্ছেন আর ছেলে মানুষের মত হেসে বলছেন "মঙ্গল হোক"। এও যেন এক খেলা চলল।একটা যেন আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল, সেখান থেকে ছুটে আসতে লাগল মায়ের আশীর্বাদ নিতে। দিদি মুগ্ধ নেত্রে এই সব দেখে মাকে বললেন, "চিরদিনই দেখে আসছি যে তুমি যখনই যে কাজটা আরম্ভ করাও, তখনই তার মধ্যে সৌন্দর্যের এমন একটি রস ঢেলে দেওয়ার ফলে উৎসবের আনন্দ জমাট বেঁধে ওঠে। তা যেমনিই অপূর্ব আবার তেমনিই অচিন্তনীয়।" দিদির কথা শুনে মা হাসতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর মায়ের ভক্তদের মধ্যে কে একজন বলে উঠলেন, "দিদিমা (মায়ের মা) কি মায়ের আশীর্বাদ নিতে আসবেন না? এই সময় মা নিজের ঘরে চৌকিতে বসেছিলেন। মা অমনি বললেন, "বেশ ত ডাক

মুক্তানন্দস্বামীকে।" এই বলেই মা একটু নীচু স্বরে বললেন, "এখন মা আর আমি শরীর দিয়েও এক হব, যদিও এক ত আছেই। এখন মা পারলেই হয়।"

মায়ের কথা শেষ হতে না হতেই দিদিমা এসে উপস্থিত হলেন। মা চৌকি থেকে নেমে দিদিমাকে বললেন, "তুমি এখন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়।" দিদিমা তাই করলেন। ভক্তেরা উৎসুক হয়ে মার কাণ্ড লক্ষ্য করছিলেন। মা দিদিমার হাত ধরে টেনে লম্বা করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভঙ্গিতে শুইয়ে দিলেন ও নিজেও ঐভাবে বিপরীত দিক থেকে পাশে শুয়ে দিদিমার পা দুটি নিজের মাথায় নিয়ে পড়ে রইলেন। মায়ের পাও দিদিমার মাথায় লেগে গেল। দুই শরীর একভাবে রইল- দুই দিকেই পা এবং দুই দিকেই মাথা এই সময় মা বললেন, "কে কাকে আশীর্বাদ করে। সবাই যে এক। তাঁরই এই প্রণাম।" আবার বললেন, 'এক আত্মস্বরূপ তো? একটা থেকেই দুইটা, দুইটা থেকে ও একটা। সে যে সীমাবদ্ধ হয়েও সীমাবদ্ধ নয়।" এই দেখে ভক্তরা উভয়কে প্রণাম করতে লাগলেন। মায়ের অপরূপ ভাব কিছুক্ষণের জন্য দেখা গেল। এই ভাবে এই বিন্ধ্যাচল আশ্রমেই ভক্তরা শ্রীগুরু ও ইষ্টের মিলন স্বরূপ দেখে ধন্য হলেন। হে শ্রীগুরু ও ইষ্টের মিলন ভূমি! তোমায় প্রণাম।

মায়ের চরণে গঙ্গা-

সেদিন ঝুলন পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। তাই রাত্রি সাড়ে ১১টা অবধি কীর্তন চলল। শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষার খেলা রাত্রি সাড়ে ৯টা থেকে রাত্রি সাড়ে ১২টার মধ্যে হয়েছিল। তাই ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ সময়ে জপে বসে গেলেন। রাত্রি প্রায় ৪টার সময় মা দিদিকে বললেন, "গঙ্গা স্নান করতে যাবি না? দিদি বললেন, "আমি আর যাব না।" মা তখনই ঘর থেকে বারান্দায় বের হলেন। দিদি সঙ্গে সঙ্গে মাকে বললেন, "তুমি গঙ্গাস্নান করতে বল নাকি? যদি বল যেতেই হবে।"মা বললেন, "না না, আমি যেতে বলি না। তবে আমি এখনই গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।"এই বলে মা দিদিমার ঘরে ঢুকলেন। দিদি মার সঙ্গে গিয়ে বললেন; "তুমি যদি গঙ্গাস্নানে যাও তবে আমি ত যাবই।"

মা গিয়ে দিদিমাকে বললেন, "মা গঙ্গায় যাবে নাকি?" দিদিমা ঘুমুচ্ছিলেন। হঠাৎ জেগে উঠে বসলেন। দিদিমা উঠে বসতেই মা তাঁর পা দুখানি টেনে বের করে নিজের মাথায় দিতে দিতে বলতে লাগলেন, "এই যে অমি গঙ্গাস্নান করছি।" এই বলে দিদিমার পা দুখানি নিজের মাথায় লাগিয়ে চৌকির উপরেই মাথা রেখে চোখ বুজে রইলেন। মার সঙ্গে উদাসজী, হরিরাম জোশী এবং দিদি ছিলেন। আর সকলে মার ঘরে বসে কীর্তন করছিলেন। দিদি মায়ের ঐ কথা শুনে তখনই বলে উঠলেন, "বা বেশ ত তুমি শিখিয়ে দিলে- তোমার মার পা মাথায় দিয়ে, তোমার গঙ্গাস্নান হল এখন আমরাও আমাদের মার পা মাথায় নিয়ে গঙ্গাস্নান করি।" এই বলে দিদি মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলেন এবং হরিরাম ভাই পভৃতিকে প্রণাম করতে বললেন। তারা যেই প্রণাম করতে গেলেন অমনি মা যেমন সচরাচর বলে থাকেন, তাই বললেন, "পা ছুঁয়ে প্রণাম করো না।" দিদি বললেন, "আজ ওসব হবে না।" তখন সকলেই মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার সুযোগ পেলেন। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তাঁদেরও ডেকে আনা হল। মা একভাবে স্থির হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর মা মাটিতে শুয়ে পড়লেন। এইভাবে মায়ের চরণ স্পর্শে সকলেই ধন্য। পরের দিন বিকালে আবার মা দিদিমার পায়ে মাথা দিয়ে বসে রইলেন। ঐ সময় মায়ের একটি ফটো তোলা হল। নিজ জননীর চরণে প্রণাম করলে যে গঙ্গাস্নান হয় অথবা গঙ্গাস্নানের ফল হয় সেই শিক্ষণীয় কথাটিই মায়ের এই লীলাতে প্রকাশিত হল।

একবার বিন্ধ্যাচলে প্রভুদত্তজী, চক্রপাণিজী প্রভৃতি মহাত্মারা মায়ের আদর আপ্যায়ন অতিথি সৎকারে প্রীত হয়ে বলেছিলেন, "মাতাজীর যেমন ব্যবহার, যত্ন, অতিথি পরায়ণতা, তেমন সাধারণ মানুষের সম্ভব হয় না।"

বিন্ধ্যাচলে কালীপূজা ও অন্নকূট

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে বিন্ধ্যাচল আশ্রমে শ্রীশ্রীকালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সকলেরই ইচ্ছা ছিল, মা-কেই কালী রূপে পূজা করা হয়। কিন্তু মা রাজী না হওয়ায় কালী ও মায়ের ফটোর উপরেই পূজা সম্পন্ন হল।

পরদিন প্রভুদত্তজী দলবল নিয়ে বিন্ধ্যাচলে এলেন। আগে থেকেই জানা ছিল যে তিনি এখানে এসে অন্নকূট করবেন। তাই মা নিজেই সকলকে দিয়ে পূর্ণভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কাশী থেকে নানা রকমের ফল ও মিষ্টি আনা হয়েছিল। যথাসম্ভব বিভিন্ন ব্যঞ্জন ও সেই পরিমাণে অন্ন ও রান্না হয়েছিল। প্রভুদত্তজী এসে এই সমস্ত আয়েজন দেখে অবাক হলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পাহাড়ের উপর এরকম বন্দোবস্ত কিভাবে হতে পারে তা তিনি ধারণাও করতে পারলেন না। কিন্তু মার সমস্ত কাজই অদ্ভুত। মা যখন যা করতেন,তাই সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠত। আনন্দময় পুরুষ প্রভুদত্তজী সব দেখে আনন্দে বলে উঠলেন, "মা জঙ্গলে মঙ্গল করে দিয়েছেন।" তরু কুটীরে ভোগের সব উপকরণ সুন্দর ভাবে সাজানো হল। সন্ধ্যার পর প্রভুদত্তজী ভোগ দিলেন, আরতি করলেন। প্রসাদ বিতরণের পর মা ও প্রভুদত্তজী ভোগে বসলেন। ভোগের পর প্রভুদত্তজী ঝুঁসি ফিরে গেলেন।

কন্যাপীঠের মেয়েরাও এই সময় বায়ু পরিবর্তনের জন্য বিন্ধ্যাচলে ছিল। মা তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন। সেখানে তারা মার সঙ্গে খেলত।

বিন্ধ্যাচলে গীতা জয়ন্তী মহোৎসবের সূত্রপাত-

এই বিন্ধ্যাচল আশ্রমেই আমাদের গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩৫১ সনে) শী প্রারম্ভে মা যখন বিন্ধ্যাচলে পাহাড়ে এই আশ্রমটিতে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে এলাহাবাদের রায় বাহাদুর শ্রী দেবেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী যমুনাদেবী কিছুদিন মাতৃ সঙ্গ করার ইচ্ছায় বিন্ধ্যাচলে এলেন। কয়েকদিন মার কাছে থাকার পর একদিন তাঁরা মার চরণে নিবেদন জানালের যে তাঁদের শ্রীগুরুদেব শ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রমের আচার্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গীতাজয়ন্তী উৎসব করেন। এই উৎসবে তাঁদের সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা তাঁদের বললেন, "বাবাকে লিখে দেওনা এবার বাবা এখানে এসে গীতাজয়ন্তী উৎসব করুক।" মায়ের প্রস্তাব মত দেবনারায়ণ বাবু ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের গুরুদেবকে এই সংবাদ জানান।

শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের মধু মাখা ডাক শুনে পরম আনন্দে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও শিষ্যগণ সহ বিন্ধ্যাচলে এসে মার উপস্থিতিতে পাঁচদিন ব্যাপী গীতা জয়ন্তী উৎসব খুব উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গে পালন করেন। পূজার পর যজ্ঞ করলেন। গোপাল ঠাকুর মহাশয় আবেগ ভরে বলেছিলেন, "মা, মা, মা আমার গীতা গীতা। মাকে তোমরা দেখ। মা আমার চলন্ত গীতা।" এই গীতাজয়ন্তীর পর থেকেই আমাদের আশ্রমে গীতা জয়ন্তী প্রচলিত হয়।

শ্রদ্ধেয় গোপাল ঠাকুর বিন্ধ্যাচল আশ্রমের তরুকুটীরে ছিলেন। এখানে তিনি মার কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। বিন্ধ্যাচল থেকে যাওয়ার সময় তিনি মাকে বললেন,"পুস্তকে চৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয়ে পড়েছিলাম যে তাঁকে দেখে সকলে মগ্ধ হত। তিনি যখন গান ধরতেন তখন এক অপূর্ব ভাব সঞ্চারিত হত। এই সব কথা এতদিন ভাল বুঝিনি। মা যখন গান করলেন, তখনই এই বিষয়টি একটু বুঝতে পারলাম। গানে যে মাথার চুল থেকে পা নখ পর্যন্ত শিহরণ জাগে এইটি আর কখনই বুঝিনি।

❀
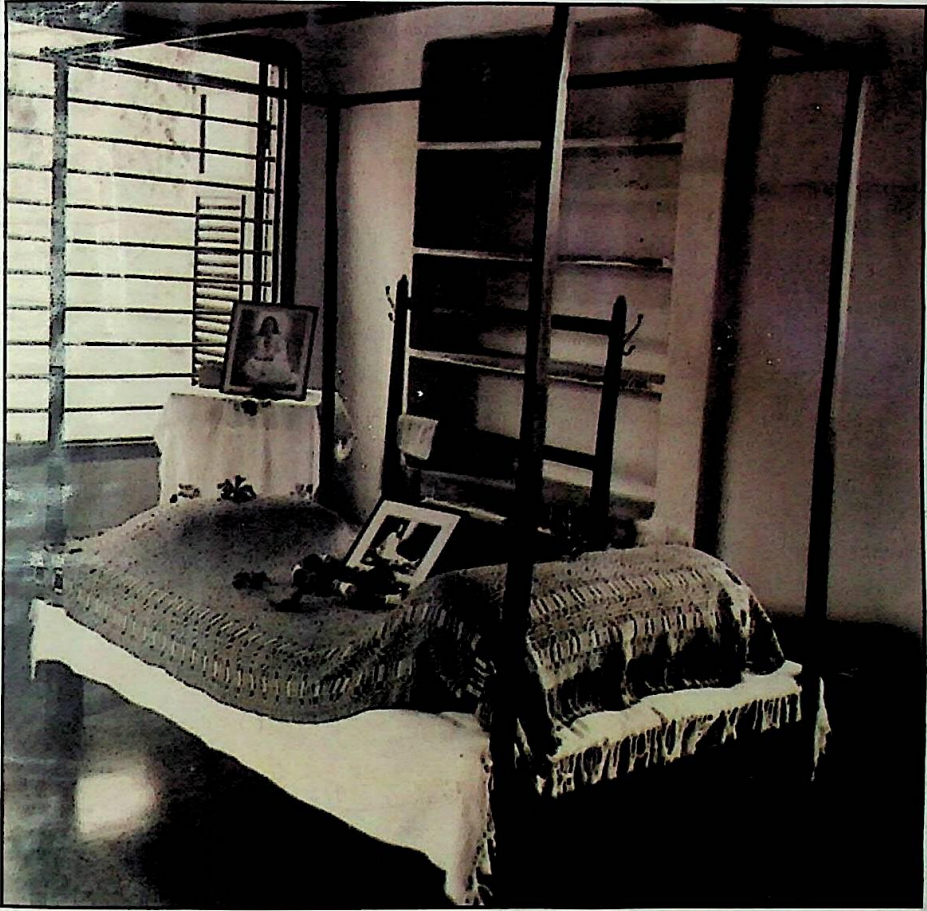
বিন্ধ্যাচল আশ্রমের মায়ের ঘর।

বিন্ধ্যাচল আশ্রমের গুহা।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

(পূর্বানুবৃত্তি)

-সুধীর দত্ত

অগ্নি হলেন স্বধা আর আহুতি স্বাহা। অন্তরীক্ষে যিনি বিদ্যুৎ, দ্যুলোকে যিনি আদিত্য, পৃথিবীস্থানে তিনিই অগ্নি। তিনিই প্রত্যক্ষ দেবতা। এই অগ্নি গুরু, পুরোহিত এবং সত্যপথের দিশারী। তাই ঋষির প্রার্থনা "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্।" হে অগ্নি, তুমি আমাদের সুপথে নিয়ে চল। এইপথে অচৈতন্যের পর্যবসান হয় বিশ্বচৈতন্যের হিরন্ময় জ্যোতিতে। কেননা অগ্নি উজিয়ে চলেছে আদিত্যের দিকে, যেহেতু অগ্নি স্বরূপত: আদিত্যই। এই অগ্নিকে জাগিয়ে তুলতে হয় ভিতরে।তাকে রাখতে হয় অনির্বাণ। দেহ-প্রাণ-মন ও অহংকে আহুতি দিতে হয় তাতে। এই জীব ও জগৎ তখন ব্রহ্মের অন্ন। অর্থাৎ ব্রহ্ম তখন অন্নাদ। আবার এই ব্রহ্ম ফিরিয়ে দিচ্ছেন সবকিছু অবশেষরূপে, যা কিনা তাঁর প্রসাদ। এইভাবে নিত্য আদান-প্রদান চলছে লোক ও লোকোত্তর জগতের মাঝে। এইভাবে সব কর্মের মধ্যে আছে ঈশ্বরের আবেশ ও অনুপ্রবেশ যার অনুভবে সবকিছুই ঈশাবাস্যম্। এ-ই হল দৃষ্টির শুদ্ধি। তার অধিদৈবত প্রত্যক্ষ। এইভাবে মানবের উত্তরণ ঘটবে দেবত্বে, কেননা ভূলোক ও দ্যুলোক মাঝে পাতা আছে আদান-প্রদানের এবম্বিধ অদৃশ্য সিঁড়ি। মানুষকে চলতে হবে এই পথে। তাই গুরু বললেন, "এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ য:" (গীতা ৩/১৬), যে ইহ জগতে এইপ্রকার প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুগামী হয় না। "অঘায়ু ইন্দ্রিয়রামা:" (ঐ), সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত মোঘায়ু পাপচারীগণ "মোঘং পার্থঃ স জীবতি" (ঐ), হে পার্থ বৃথাই জীবনধারণ করে। তাদের জীবন বৃথা, কেননা তারা ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তারা আত্মকেন্দ্রিক এবং সীমিত-চেতন। নিজ দেহের পরিচয়ে তাদের পরিচয়। চৈতন্যের এহেন সংকোচই পাপ। আর সেইজন্যই গৃহস্থকে জাগিয়ে রাখতে হয় গার্হপত্য অগ্নিকে। অগ্নি গৃহপতি। উর্দ্ধমুখ সত্যধর্মের প্রতীক। আধ্যাত্মিক এই অগ্নিকে জাগিয়ে রাখাই হুঁশে থাকা। গার্হ্যস্থজীবনে চাই শুদ্ধি, যা ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রবল হয়ে আসে আসুরী গৃধ্নুতা। তাই গার্হপত্য অগ্নি হল সেই জ্ঞান ও ধর্ম যা শাসন করে মানুষের কাম ও কাঞ্চন-বাসনা। তাই পঞ্চমহাযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য করণীয় অনুষ্ঠান যার দ্বারা তার কুণ্ঠিত চেতনা প্রসারিত হয় ভূতে ভূতে, বিশ্বচেতনায়। এই যে ইন্দ্রিয়াসক্তদের ইন্দ্রিয়ে আরাম, এই বৃত্তিকে শোধন করে ঋষিরা গার্হ্যস্থ জীবনকে দেখেছেন তার অধিদৈবত স্বরূপে। স্ত্রীতে ও পুরুষে যে রজ: তা ছিল তাদের কাছে যথাক্রমে অগ্নি ও আদিত্যের রূপ। তাঁরা দেখেছেন, স্ত্রীতে এই আত্মা পৃথিবীরূপে; পুরুষে এই আত্মা দ্যুলোকরূপ। ঐই আত্মা ঐ আত্মার কাছে আত্মদান করে। ফলত: প্রজনন তাঁদের দৃষ্টিতে ছিল এক দৈব বিষয়। নরনারীর দাম্পত্য জীবন ছিল প্রজাকাম প্রজাপতির যজ্ঞের অনুবর্তন। নারীই সেই যজ্ঞকুন্ড যেখানে পুরুষ আত্মাহুতি দেন নিজেকে পুনসৃষ্টি করতে, যেমন দেবতা নিজেকে বহুভাবে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ-যজ্ঞের দ্বারা। শুধু ব্যষ্টিজীবনই নয়, সমগ্র প্রকৃতিই তার কর্মসমূহ আহুতি দিয়ে চলে পুরুষের উদ্দেশ্যে। যজ্ঞের মূলকথা হল ত্যাগ এবং ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ, যে ভোগে বন্ধন নেই, আছে প্রাণের আরাম এবং আত্মার শান্তি। আর এইজন্য ঋষির উপদেশ: "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা" (ঈশ:১)

আত্মারাম ও কর্ম-

.যে মানুষ অভাবী, যে বাস করে কামনা- বিদ্ধ অবর প্রকৃতিতে, গুরু তার জন্য দিয়েছেন যজ্ঞ-কর্মের ব্যবস্থাপত্র যে যজ্ঞের ভোক্তা স্বয়ং ভগবান। এখন বলছেন তাঁর কথা যার কর্ম নেই, নেই মা আনন্দময়ীর ভাষায় "অভাবের স্বভাব"। তিনি আত্মরতি, আত্মাকেই জেনেছে আনন্দের অফুরণ উৎসরূপে, তিনি আত্মতৃপ্ত, ইন্দ্রিয়ের অল্প সুখ-সন্ধান ত্যাগ করে আত্মার মধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছে ভূমার আনন্দ। গুরু বলেছেন এইরকম "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট: তস্য

কার্যং ন বিদ্যতে" (গীতা ৩/১৭) অর্থাৎ আত্মতুষ্ট এরকম ব্যক্তির করণীয় কিছু নেই। কারণ তিনি আতস্থ, আত্মায় আত্মা হয়ে আছেন, আছেন স্ব-রূপে। স্ব-ভাবে। যাঁকে প্রাচীনেরা বলেন "নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি"। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শিষ্যকে দিব্যগুরু বললেন এক মহত্তর কথা, কর্মযোগের প্রাসঙ্গিকতা। বললেন, এটা ঠিক যে এখানে কর্মের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এরকম ব্যক্তির কর্ম-করা বা না করার প্রতি কোন আসক্তি নেই। "নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন" (গীতা ৩/১৮)। তাঁর পক্ষে "কৃতেন" বা "অকৃতেন" কোন কর্ম করা বা না করায় কোন "অর্থ" অর্থাৎ প্রয়োজন নেই।

আর যেহেতু প্রয়োজনীয়হীন: "ন চাস্য সর্বভূতেষু" (গীতা ৩/১৮) এই জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নন- "কশ্চিৎ অথর্ব্যপাশ্রয়: (ঐ)। বললেন, এরকম ব্যক্তি যেহেতু সর্বপ্রকার প্রয়োজনরহিত, তিনিই ভাগবত কর্মে যথার্থ অধিকারী এবং সেইহেতু তাঁর দৃঢ় উপদেশ "তস্মাৎ অসক্ত: সততং কার্যং কর্ম সমাচর" (গীতা ৩/১৯)-হে অর্জুন অসক্ত বা আসক্তিহীন হয়ে সর্বদা "কার্যং কর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম সর্বদা সম্যকরূপে সম্পাদন কর। কর্তব্য কর্ম কি? না, বর্তমান তোমার সামনে কৃত হওয়ার জন্য যে কর্ম স্বয়ং উপস্থিত হয়েছে। অর্জুনের সামনে সেই কর্ম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, যদিও যুদ্ধের প্রাক্কালেই গান্ডীবধণ্বা অর্জুনের শরীর কম্পিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন এবং ধনু হস্তচ্যুত। অনাসক্ত পুরুষ যথাবিধি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হয়। গবান অর্জুনকে যে কথা বলতে চাইলেন তাহল এই যে সকাম কর্ম যেমন বন্ধনের কারণ, কর্মবিমুখতাও অহং-প্রসূত বৃত্তি। প্রথমটি রজ: প্রণোদিত এবং দ্বিতীয়টির হেতু তম:। একটি যদি হয় প্রবৃত্তি অপরটি নিবৃত্তি নয়, অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ তামসিক নিশ্চেষ্টতা। যাঁর সব রকমের প্রয়োজন নিবৃত্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ যিনি সত্বে আরূঢ় একমাত্র তিনিই অকর্তারূপে কর্ম করতে পারেন। এখানে তাঁকে নিমিত্ত করে ভাগবত-কর্ম সম্পাদিত হয় মাত্র। ফলত: অর্কতা এবং অভোক্তা সেই পুরুষের কোন কর্মবন্ধন নেই।

জনকাদি রাজর্ষি বর্গের দৃষ্টান্ত স্থাপন-

বিষয়টিকে স্পষ্টতর রূপে অর্জুনের বুদ্ধিতে প্রোথিত করার জন্য ভগবান জনকাদি রাজর্ষিদের উদাহরণ দিলেন, যাঁরা কর্মযোগের দ্বারা পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই ভগবান বললেন "কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা: জনকাদায়:" (গীতা ৩/২০)। প্রসঙ্গত: জনক একটি উপাধি বা বংশ-নাম বিশেষ- যেমন মহাভারতোক্ত ধর্মধ্বজ জনক, দৈবারতি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য বিদেহ জনক এবং রামায়ণোক্ত সীতার পিতা সীরধ্বজ জনক ইত্যাদি। শুধু জনকবংশীয় রাজর্ষি গণই নয়, জনকাদি বলতে সম্ভবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বিভিন্ন পুরাণ ও উপনিষদ কথিত বহুবিধ কর্মযোগী মুক্তপুরুষ, রাজর্ষি জানশ্রুতি, রাজা প্রবাহন, কাশীরাজ অজাতশত্রু রাজা পদ্ম ও শিখিধ্বজ, রাজা অম্বরীষ ইত্যাদির কথাও বলেছেন।এঁরা ছিলেন যুগপৎ রাজা এবং ঋষি। এঁদের কর্ম ছিল প্রজ্ঞা-শাসিত। কর্মসন্ন্যাস নয়, এঁরা ছিলেন অন্তর্সন্ন্যাসের অনুসরণীয় জীবন্ত বিগ্রহ। শুধু সিদ্ধিলাভের জন্য নয়, সিদ্ধিলাভের পরেও এঁরা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেছেন। কেননা সম্পন্ন পুরুষের কর্মের প্রতি যেমন আসক্তি থাকেনা তেমনি থাকেনা কর্মের প্রতি অনীহাও। এই সব দৃষ্টান্ত দেওয়ার পরে ভগবান বললেন এরকম পুরুষকে আশ্রয় করে রূপায়িত হয় ভগবানের দিব্য সঙ্কল্প, তাঁর জগৎ-ব্যবহার। জগৎকে এইভাবে সুব্যবস্থিত করার জন্য যে কর্ম প্রবর্তিত তাই লোকসংগ্রহ। এ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ'। অর্থাৎ নিজ জীবনের আদর্শের দ্বারা সৎপথে চলতে অনুপ্রাণিত করা, কেননা মহৎ ব্যক্তিদের জ্ঞান শক্তি এবং আচরণ "ইতর: জন:" অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সামনে বাতিস্তম্ভ বিশেষ, যার আলোকে পথ দেখে তারা "যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠ: তৎ তৎ এব ইতর: জন:/ স: যৎ প্রমাণম্ কুরুতে লোক: তৎ অনুবর্ততে" (গীতা ২/২১)।

তাই ঈশ- শ্রুতিতেও দেখি অনুরূপ উপদেশ: "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা:/ এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে"। ভগবানও বললেন লোকসংগ্রহের দৃষ্টি থেকে- হে অর্জুন তোমারও কর্ম করা উচিৎ "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কতুম্ অর্হসি" (গীতা ৩/২০), যাতে করে তোমাকে আদর্শ জেনে মানুষ তমসা অতিক্রমপূর্বক জ্যেতিপথের অভিযাত্রী হয়। কর্ম সেইসব কর্মযোগী মানুষের চিত্তে কোন লাঞ্ছন বা দাগ রাখতে পারে না কর্ম সেখানে পদ্মপত্রে জলের মত বা জলস্থ পদ্মপাতার মত। জলে থেকেও জলচিহ্ন না থাকা। র্কমের ভিতরে এ হল নৈষ্কর্ম্য। অর্থাৎ যে কথাটি শ্রীভগবান ঈঙ্গিত করলেন তা হল এই যে অনাসক্তি জীবনের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। লক্ষ্য সেই পরম পদ। এবং তা সম্ভব অনাসক্তভাবে ভগবানে কর্ম নিবেদনের মাধ্যমে: "অসক্ত: হি আচরণ্ কর্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ"(গীতা ৩/১৯)।

(ক্রমশ:)

শ্রীশ্রী মা

" সাধকের স্থিতি লক্ষ্যে গতি থাকে। কিন্তু এখানে ত স্থিতি অস্থিতি, লক্ষ্য অলক্ষ্যের কোন প্রশ্নই নেই। যেমনটি নাকি প্রদীপ হাতে নিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি একটি সব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এমনটি আর কি। কিন্তু সাধকের গতির মধ্যে এইগুলি সব দেখা সম্ভব হয় না। নানা রকমের বাধা তার অতিক্রম করে চলতে হয়। একটা হল বাইরের গতি আর একটা হল অন্তর্মুখী গতি। এখানে ত আর ঐ প্রশ্ন দাঁড়ায় না। এখানে নাড়ী ও আমি, প্রশিরাও আমি, গতি ও আমি, দ্রষ্টা ও আমি, অবশ্য আমি বলে যদি একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়।

এ শরীরের তে কোন সংকল্পাদি নেই। সেজন্য দীক্ষাদি যা কিছু, সে সব দিকেই নেই। তবে এই শরীরটা হয় ত আপন মনে আছে হঠাৎ কত সময় বীজ বা সন্ন্যাসের মন্ত্র সব মুখ থেকে বের হয়ে আসছে। তখন হয়তো কেউ শুনে নিল। আবার হয়ত অন্যভাবে ও কেউ কোনটা পেয়ে তাই ধরে নিচ্ছে। এমন অনেক ঘটনা হচ্ছে যে সাধারণ লোকে একেবারে স্থির করে নেবে যে নিশ্চয়ই পূর্বের কিছু ঠিক ছিল। এসব কিছুই কিন্তু না। যা হওয়ার তাই হয়ে যাচ্ছে। কেমন জান? যেমন মাটিত আছেই। গাছ থেকে একটি ফল পড়ল তার থেকে গাছ উঠল। কেউ কিন্তু বীজ লাগায়নি। বীজ লাগালেও যেমন গাছটি হত, আপনি ফলটি পড়েও ঠিক তেমনিই গাছটি হবে। সেই গাছে ফুল ফলও একই রকম হবে। অথচ কারও ঐ রকম আগ্রহ বা সংকল্প নেই। এই রকমই আর কি।

এ শরীরের তো ভেদ- দৃষ্টি নেই, মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে। অনেক আশ্রমে বলা হয়েই থাকে, সেইখানকার বিধি নিষেধ যদি মানতে পারো থাকো নয় অন্যত্র যাও। এ শরীরের নিকট সে প্রশ্ন নেই। সবাই এখানে আসে সৎসঙ্গ দিতে- হ্যাঁ সৎসঙ্গই বটে- সর্বরূপে তিনিই তো ভগবান। গাছপালা পশুপাখী সবাইকে নিয়ে এ শরীর। এ শরীরের কাছে আলাদা বলে কোথাও কিছু নেই।"

-শ্রীশ্রী মা

তপোভূমি দর্শন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

-ড০ সুচরিতা ঘোষ

২৬শে ফেব্রুয়ারি-

স্নান, পূজা আদি করে সকালে যথারীতি বিরাট পর্বে জলখাবারের পর আমরা সকলে সরোজনী মার্কেটে গেলাম কেনাকাটা করার জন্য। অজস্র রকমারী সম্ভারে ভরা বিরাট মার্কেট। দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল, সকলেই যে যার মত কাপড়, জুতো , ব্যাগ, গহনা ইত্যাদি প্রাণ ভরে কিনে মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ফিরে এলাম। স্বাতী ও ইন্দিরা তাদের নিত্যপূজা গোপালজীকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। কোথাও গেলে কেনাকাটার মাঝে দেখেছি ওদের গোপালের জন্য ফল, মিষ্টি, চকলেট ইত্যাদি কিনতে ভুল হয় না। আমরা প্রসাদ পাই আর আনন্দ করে ওদের উৎসাহ দিই আরো সুন্দর করে গোপালকে ভোগ দেবার জন্য। এখানে স্বাতী আমার সঙ্গে এক ঘরে ছিল। দেখতাম কত আদর করে সকালবেলায় সুর করে ডেকে ডেকে গোপালকে ঘুম থেকে তুলতো আদর করে খেতে দিত, ঘুম পাড়াত। খুব সুন্দর লাগত ওদের ভাবটি। বাজার থেকে ফিরে মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম নিয়ে সকলে অক্ষয়ধাম মন্দির দর্শন করতে বেরলাম। আমরা কয়েকজন অত হাঁটাহাঁটি করতে পারব না বলে বিশ্রামের জন্য থেকে গেলাম। গার্গীদি বলে দিয়েছিলেন অক্ষয়ধাম মন্দির দর্শন করতে হলে বিকালের পর যেতে কারণ ওরা সমস্ত মন্দির, ফুলের বাগান, আলো ও ফোয়ারা দিয়ে এত সুন্দর করে সাজিয়েছে যে তা দেখার মতো। ওদের বলে দেওয়া হল যেন সন্ধ্যার সৎসঙ্গে যোগ দেবার জন্যে ওরা সময় মত ফেরে। আমরা গণেনদা ও গার্গীদির সঙ্গে গল্প করে সময় কাটালাম। অক্ষয়ধাম দর্শন করে ওরা সকলে ফিরল তখন প্রায় ৮টা। হাত মুখ ধুয়ে সকলে সৎসঙ্গে যোগ দিল। সান্ধ্য কীর্তন, সদ্‌বাণীর পাঠ ও মৌনের পর সৎসঙ্গ শেষ হল। কাল ফিরে যেতে হবে ভেবেই মনটা হু হু করছে। বাড়ির টান থাকলেও বাইরে এমন খোলা সুন্দর পরিবেশে আর কিছুদিন আশ্রমবাসের অদ্ভুত আনন্দময় অভিজ্ঞতায় মনটা চাইছিল যেন আর কিছুদিন এভাবে থাকতে পারলে ভাল হত। মন কে বোঝালাম, সবশুরুরইতো শেষ আছে। মা যতটুকু দিয়েছেন তাই নিয়ে আনন্দে থাকা। রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে শুতে গেলাম। নানা আনন্দের স্মৃতিকথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

২৭শে ফেব্রুয়ারি-

আজ বিকালে কলকাতা-রাজধানী ধরে আমাদের ফিরতে হবে। সকালের দিকে যদিও কোনও প্রোগ্রাম রাখা ছিল না তবুও জলখাবারের পর অনেকেই নিজের মতো এখানেওখানে বেরল। আমি ঠিক করলাম সকালের দিকে আজ বেরব না, বিশ্রাম নেব। তারপর জিনিসপত্র গোছানোর কাজটাও তো আছে। সামনের বিরাট সবুজ মাঠের মাঝে একটা দোলনা আছে। তাতে চড়ে গার্গীদিদের সঙ্গে গল্প করে গান গেয়ে সুন্দর সময় কাটালাম। এবারের মতো আজই সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করব। দুপুরে ওরা ফিরলে সকলে ডাইনিং হলে একত্রিত হলাম। আনন্দও লাগছে, মনটা খারাপও লাগছে। গণেনদা ও গার্গীদির আতিথেয়তা, সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার আমরা কেউই কোন দিন ভুলতে পারব না। একসঙ্গে ষোলোজনের সমস্ত রকমের ব্যবস্থার দিকে সুচারু নজর দিয়ে কী সুন্দরভাবে সবটা সামলালেন তা শেখার মতো। খাবার টেবিলে দেখি একাদশীর দিন কেউ অন্ন নেবেন না তার জন্য ফল, পুরী আদির ব্যবস্থা। কার শরীর ভাল নয় তার জন্য অনুরূপ পথ্য ইত্যাদি। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে আমরা এবার রওনা হব। গণেনদা তার নিজের গাড়িটি আমাদের জন্য দিয়ে দিলেন আর ছেলেকে তার বড়ো কোয়ালিস

গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে বললেন যাতে বয়স্ক মানুষেরা সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে সহজে স্টেশনে পৌঁছাতে পারে। বাকিরা খালি হাতে শুধু নিজেদের কাঁধের ব্যাগটি নিয়ে ওনাদের বাড়ির পাশেই স্টেশন থেকে মেট্রো ট্রেন ধরে নিউদিল্লী স্টেশন পৌঁছাল। সময় মতো কলকাতার রাজধানী ট্রেন ছাড়ল। উঠে নিজেদের বার্থ ঠিক করে গুছিয়ে বসতে না বসতেই চা ও জলখাবার দিয়ে গেল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন নিরামিষ খাবার। গল্প করে পরে সন্ধ্যা হলে নিজেদের মতো ট্রেনের মধ্যেই একজায়গায় হয়ে সৎসঙ্গ করলাম। আমাদের মধ্যে একজন কথায় কথায় বললেন, আমরা কেমন সংসার থেকে দূরে, সব ভুলে ক-দিন আশ্রম-বাস করলাম। জয়ভাই আস্তে করে বললেন, সংসার থেকে দূরে আর থাকা হল কই? পকেটের মোবাইলে তো সংসারটাকে ভরে আনাই হয়েছে। রোজই বাড়ির লোকেরা কি খাচ্ছে না খাচ্ছে, কেমন আছে সবই খবরাখবর হচ্ছে। ওষুধ সময়মতো খাওয়া হচ্ছে কি না? কাজের লোক আসছে কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি কত খবরই দিনে কত বার লেন-দেন হচ্ছে। আমরা আমাদের মতোই আছি। তবু তার মধ্যে আশ্রমবাস হল। সাধুদের সঙ্গ হল ও তাঁরা কেমন করে একমুখী ভাব নিয়ে শ্রীমায়ের ওপর নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করেন তা দেখা গেল। এটাই অনেক। এর সংস্কারই আমাদের সময়ে অমৃতের পথে একাগ্র হয়ে চলার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করবে। ন-টার সময় রাত্রের খাবার দেওয়া হল। আমরা খেয়েদেয়ে ক-দিনের সকলের সঙ্গে ভ্রমণের আনন্দের স্মৃতি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার ট্রেন একদম ঠিক সময়ে চলেছে। সকালে রাজধানী নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগেই শিয়ালদহ পৌঁছাল। তিনটে গাড়ি আগে থেকে বলা ছিল। ভাগাভাগি করে তাতে উঠে আমরা যে যার বাড়ি পৌঁছোলাম, হাসিমুখে ও সুস্থ শরীরে।

একটা কথা মনে হচ্ছে, যখন আমরা বাড়িতে আমাদের এই ভ্রমণের গল্প করি, তখন প্রায় সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, "এত সব কে ব্যবস্থা করে?" জয়ভাই শ্রীমায়ের আশ্রমের সকলের সঙ্গে পূর্বপরিচিত বলে সেখানকার ব্যবস্থাদি তাকেই করতে হয়। যদি এই কথা বলি জয়ভাই বলেন, "আমি কোনও ব্যবস্থা করি না। সকলের সব ব্যবস্থা মা-ই করেন, তিনিই আমাদের কৃপা করে ক-দিন তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গ ও আশ্রমবাসের সুযোগ করে দেন। এই ছোট্ট কথাটি যে কত সত্য তা আমরা ওখানে গিয়ে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি। আমরা প্রায় আশিভাগই বয়স্ক, তার মধ্যে আমার দৃষ্টি বেশ ক্ষীণ, যার জন্য অচেনা জায়গায় যেতে সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এক এক জন এক এক পারিপার্শিক অবস্থায় বড়ো হয়েছেন ও আছেন। আর মায়েদের ঘাড়ে সংসারের অনেক দায়িত্বও থাকে। তৎসত্ত্বেও মায়ের অসীম কৃপায় সবাই তো কত আনন্দেই ঘুরে এলাম। কারো কোনও অসুবিধা হয়নি। সবাই সুস্থ শরীরে প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে ফিরে এলাম। মা যে আনন্দময়ী! তাই আজ একটি গানের কলি মনে পড়ছে।

আহা! কি করুণা তোমার।

ভারতের অধ্যাত্মবাদ (ভক্তিযোগ)

-ড: নলিনী ব্রহ্ম:

শ্রীভগবানকে সমগ্রভাবে জানিতে হইলে, পূর্ণ সম্যক্ রূপে পরিপূর্ণ তত্ত্ব ভাবে জানিতে হইলে, শ্রীভগবানের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। তিনি যাহাকে নিজস্বরূপতত্ত্ব অবগত করাইবার ইচ্ছা করেন, তিনিই কেবল জানিতে পারেন।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্না।
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্। -শ্রীমদ্ ভাগবত।,
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে।- চৈতন্যচরিতামৃত

তিনি স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে জীবের শক্তি দ্বারা তাঁহাকে ধরিবার উপায় নাই। তিনি জীবশক্তির উর্ধ্বে অবস্থিত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ন মাং বিদু: সুরগণা: প্রভবং ন মহর্ষয়:। দেবতা মহর্ষি প্রভৃতি আমার উৎপত্তি বা জন্ম বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কারণ তাঁহারা আমা হইতেই সৃষ্ট, আমিই তাঁহাদের আদি, তাঁহারা আমার কথা, জানিবেন কেমন করিয়া? ত্রিভূবনে এমন কোন বস্তু বা প্রাণী নাই যিনি আমার কথা আমার জন্ম বা উৎপত্তির কথা জানিতে পারেন। তাই শ্রীভগবানকে ধরা, তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি করা জীবসামর্থ্যের বাহিরে।শ্রীভগবান কিন্তু ভক্তবৎসল- একমাত্র ভক্তিই তাঁহাকে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত করাইতে পারে। এই ভক্তি কোন সাধন নহে। ইহা চিত্তের একটি অবস্থা মাত্র- তাঁহাকে পাইবার জন্য উৎকট লালসাই হইতেছে ভক্তি বা প্রেম। তাঁহার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রাণমন নিয়োজিত করিয়া কেবল তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার স্মরণে, তাঁহার কথায় নিরন্তর লাগিয়া থাকিতে পাইলে অন্য চিন্তা, অন্য স্মরণ, অন্য কথা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লইয়া তাঁহাতে নিত্যনিযুক্ত হইতে পারিলে অসাধ্য সাধন হয়। অসাধনের ধন শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছায় আসিয়া ভক্তকে কোলে তুলিয়া লন এবং তাঁহার সমস্ত তত্ত্ব তাঁহার অতি প্রিয়জনকে বুঝাইয়া দেন। সমগ্র পূর্ণ তত্ত্বকে পাইতে হইলে পূর্ণ অখণ্ড সাধন প্রয়োজন; কিন্তু অখণ্ড শক্তি জীবের নাই। তাই কেবল তাঁহার মুখের দিকে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণটা লাগাইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়, তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া কেবল লালসার বৃদ্ধি করিয়া যাইতে হয়, কেবল অন্তরের স্থান হইতে কাতর ক্রন্দন তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে হয়, তাহা হইলে এই কাতরতায়, এই আকুলতায়, এই ব্যাকুলতায় সেই কৃপাসিন্ধুর কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সেই যাদুকরের মোহন করস্পর্শে খণ্ডিত জীবশক্তি অখণ্ড হইয়া উঠে এবং অখণ্ড শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া জীব পরম কৃতার্থতা লাভ করে। কর্ম মায়ার পারে, দ্বৈতের পারে যে অদ্বৈত অখণ্ড তত্ত্ব আছে, তাহার সন্ধান দিয়া দেয়; রজ: তম:র পারে যে সত্ত্বের এক অপূর্ব স্পর্শ আছে তাহার সন্ধান দিয়া দেয়,. ভক্তি এই অখণ্ড তত্ত্বের প্রতি লালসা বা আকর্ষণ জাগাইয়া তোলে, সত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া নিরন্তর ডুবিয়া থাকে। কর্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে সত্ত্বের উন্মেষে, আর ভক্তির পরাকাষ্ঠা হইতেছে সত্ত্বের পরিব্যাপ্ত অবস্থায়। ভক্ত তাই সত্তসমাবিষ্ট। শ্রীভগবান ত্রিগুণময়ী মায়ার পারে অবস্থিত। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পদার্থই ত্রিগুণের অধিকারে স্থিত। একমাত্র ভগবানই মায়ার উর্ধ্বে- তিনি মায়াধীশ এবং মায়াতীত। তাঁহার মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তাই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ঐ মায়াধীশের শরণ লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মায়ার মধ্যে থাকিয়া, মায়ার অধিকারের কোন বস্তুর আশ্রয় লইয়া মায়াকে অতিক্রম করা যায় না। মায়ার মধ্যে সবই খণ্ডিত। খণ্ডিত বস্তুর দ্বারা অখণ্ডকে পাওয়া যায় না, তাই অখণ্ডকে পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে ঐ অখণ্ড শ্রীভগবানে শরণাগতি। ইহাই ভক্তিবাদীর

সিদ্ধান্ত। ভগবানের কৃপা ভিন্ন, উপর হইতে স্বেচ্ছায় তাঁহার অবতরণ ভিন্ন জীব তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। কৃপা এবং ভক্তি পরস্পর মুখাপেক্ষী। উপর হইতে দেখিলে যাহা কৃপা, নীচের দিক হইতে তাহাই ভক্তি। ভক্তি পূর্ণ নিষ্কাম, কেন না কামনা যেখানে, সেখানে কাম্যবস্তুর সহিত কামকামীর ব্যবধান বা অন্তর থাকে। কামনার বস্তু সর্বত্র দূরে অবস্থিত, তাই সকাম ব্যক্তির কাম্যবস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ তাহা ব্যবহিত আকর্ষণ; কিন্তু ভক্তের যে তীব্র লালসা ইহা অব্যবহিত, ইহা সহজ, স্বাভাবিক আকর্ষণ। কামনারহিতত্বের প্রাণই হইতেছে এই অব্যবহিতত্ব বা স্বাভাবিকত্ব। যেখানে অন্য জন্য আকর্ষণ, যেখানে আকর্ষণের হেতু আছে, সেখানে কামনা। আর যেখানে অহেতুক আকর্ষণ, যেখানে সহজ স্বাভাবিক ভালবাসা, যে ভালবাসার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না- তাহাই পূর্ণ নিষ্কাম ভালবাসা। ইহাই শুদ্ধা ভক্তি, ইহাই প্রেম। যখন প্রাণ ভগবানের ভগবত্তাকে না চাহিয়া, তাঁহার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য বিভূতির দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল তাঁহাকেই চায়, যখন হৃদয় শুদ্ধির সৎকুসুমরাজিতে বিভূষিত হইয়া পরম বিশুদ্ধ পরমতত্ত্বের প্রতি এক অপ্রাকৃতনবীন আকর্ষণ অনুভব করে, যখন মন প্রাণ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইয়া তাঁহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, যখন জীব সর্বভাবে তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পরম ব্যাকুলতা অনুভব করে। তখনই কামগন্ধহীন শুদ্ধ প্রেম বা ভক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়। যতক্ষণ ক্ষুদ্র বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হই ততক্ষণ শ্রীভগবানের আকর্ষণ যে কি বস্তু তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। পূর্ণের, ভূমার অখণ্ড তত্ত্বের আকর্ষণ অনুভব করিতে হইলে, নিজেকে 'অন্যে'র ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে হয়। যাহাকে আমরা উপরে শুদ্ধা ভক্তি বা নিষ্কাম ভালবাসা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি তাহা মানবজীবনের পরিণতির একটি সহজ স্বাভাবিক অবস্থা। যতদিন জীব সেই পরিণত অবস্থালাভ না করে, ততদিন শ্রদ্ধা ভক্তি যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধিগোচর হয় না। জীব যেমন যেমন মতির স্তরে উপনীত হয় তাহার কামনার বস্তুও তদনুরূপ হয়। যতদিন পার্থিব বিষয়বস্তু জীবকে আকর্ষণ করে, যতদিন ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়সুখে জীব আসক্ত থাকে, ততদিন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সুখ তাহার অনুভবে আসে না। আবার যখন জীব স্বাভাবিক পরিণতিক্রমে ইন্দ্রিয়ের উপরের ভূমির সন্ধান পায় তখন বিনাশশীল বস্তু মাত্রই তাহার নিকট অল্প বা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং জীব তখন অবিনাশ আত্মত্বের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অবিবেকী লৌকিক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুতে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, ভক্তজনেরও অখণ্ডতত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রতি আকর্ষণও তেমনই স্বাভাবিক। প্রাকৃতব্যক্তি যথোপযুক্ত পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই শ্রীভগবানের অনন্ত ভূমা বা অখণ্ডতত্ত্বের কোনো ধারণাই করিতে সমর্থ হয় না এবং তাঁহার প্রতি কোনো আকর্ষণও অনুভব করে না। এই প্রাকৃত ব্যক্তিই যখন পরিণতি লাভ করে, যখন সে ষোলকলা পূর্ণ হইয়া উঠিয়া পূর্ণত্বের আভা প্রাপ্ত হয় তখন সে অখণ্ড শ্রীভগবানের প্রতি এক সহজ স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। যতদিন জীবের চরম পরিণতি না হয় যতদিন পূর্ণত্বের আভাস না মিলে ততদিন পূর্ণের প্রতি সহজ স্বাভাবিক আকর্ষণ বা নিষ্কাম ভক্তি লাভ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় স্তরে ইন্দ্রিয়াসক্তি জীবের এই স্তরে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সহজ স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়স্তরে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে গেলে তাহা সকাম হইয়া যায়, কারণ শুদ্ধ ভগবান এই স্তরে উপাস্য হইতে পারেন না। আমি চাহিতেছি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়- বিষয়ের প্রতি আকর্ষণই আমার উপলব্ধির বস্তু ভগবান্ যদি আমাকে আমার অভীষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখোপকরণ বিষয় দান করেন তবেই ভগবান আমার উপাস্য হইতে পারেন, নতুবা নহে। এই ইন্দ্রিয় স্তরে ভগবানের উপাসনা সকাম উপাসনা। শুদ্ধ নিষ্কাম উপাসনা হইতে পারে সেই অবস্থায়, যেখানে ইন্দ্রিয় সুখ কাম্য নহে- যেখানে শুদ্ধ নিরাবরণ রসস্বরূপ শ্রীভগবানই ঈপ্সিত। পরমতত্ত্ব রসস্বরূপে যিনি মজিয়ান, ইতর রসে যাঁহার আর রতি নাই তিনিই রসিক, তিনিই প্রেমিক তিনিই ভক্ত।

ইন্দ্রিয় স্তরে প্রাকৃত জন নিষ্কাম,হন না ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যাক্তি ইন্দ্রিয়স্তরে উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করে না। সুখ ঈপ্সিত সুখ চাই; সুখ ভোগ করি কেন, ইহার কোন প্রশ্ন উঠে না তাই বিষয়কামী ব্যক্তি বিষয়ের নিষ্কাম সেবক। বিষয় তাহার চাইই; কেন চাই তাহার একমাত্র উত্তর হইতেছে যে, বিষয় সুখ দান করে। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিষ্কাম সেবক। ভগবান রস স্বরূপ, ভগবান প্রিয়তম, ভগবানের আকর্ষণ নিবারণ করা যায় না ভগবানকে চাইই। ভগবান ভিন্ন আর কিছুই চাই না। ভগবানের ঐশ্বর্যের জন্য ভগবানকে চাই না, ভগবানের কৃপার জন্য ভগবানকে চাই না, ভগবান মুক্তিদাতা বলিয়া ভগবানকে চাই না, ভগবান সংসার দাতা বলিয়া ভগবানকে চাই না। ভগবানকে চাই কেননা তিনি মধুর, তিনি অতিমধুর, তিনি মধুরতম, তিনি সব হইতেও মধুর। তাঁহার মাধুর্যের এমনই আকর্ষণ ভক্ত অনুভব করেন যে তিনি ক্ষণতরেও তাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ইহাই শুদ্ধা ভক্তি, ইহাই প্রেম, ইহাই পরিপূর্ণ নিষ্কাম অবস্থা।

উপনিষদের আলো

ঈশাবাস্যোপনিষদ্

সম্ভূতিঞ্চবিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাহমৃতমশ্নুতে ।।১৪।।

ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনার সমুচ্চয়-

যে অসম্ভূতি (অব্যক্তপ্রকৃতি) আর কার্যব্রহ্ম এই দুইটিকে একই সঙ্গে (এক ব্যাক্তির দ্বারা অনুষ্ঠেয়) জানতে পারে -সে কার্য ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা (অনৈশ্বর্য, অধর্ম, কামাদিদোষরূপ) মৃত্যুকে অতিক্রম করে অসম্ভূতির দ্বারা (প্রকৃতি লয় রূপ) অমরত্বকে প্রাপ্ত করে ।।১৪।।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ।।১৫।।

উপাসকের মার্গযাচনা-

আদিত্য মণ্ডলস্থ সত্য ব্রহ্মের দ্বার (স্বর্ণের মত চকচকে ব্যষ্টি সমষ্টি অহংকাররূপ) জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রয়েছে। অতএব হে পূষণ! আমার মত সত্যধর্মী জিজ্ঞাসুকে সেই সত্যাত্মার উপলব্ধি করাবার জন্য তুমি সেই আবরণ কে সরিয়ে দাও।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্যব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।।১৬।।

পুনশ্চ উপাসকের মার্গযাচনা-

হে জগতপোষকসূর্য! হে একাকীগমনকর্তা! হে যম! (প্রাণ ও রসের পোষণ কর্তা) সূর্য! হে প্রজাপতির প্রিয়! তুমি নিজের কিরণ সরিয়ে নাও। যাতে তোমার অতিশয় কল্যাণময় রূপ দেখতে পারি। এই যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ, সেই আমি ।।১৬।।

বৃন্দাবন আশ্রমে যুগলমূর্তি স্থাপনা-

-স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

রায়বাহাদুর শ্রীনারায়ণ দাসজীর তত্ত্বাবধানে যখন মন্দির নিমার্নের কার্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে তখন লীলাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল হইতে লাগিল একই মন্দিরে যোগীভাইয়ের বিগ্রহ এবং রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়া রাজের প্রদত্ত ছলিয়া মূর্তি দুইটিই প্রতিষ্টিত হন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ঁনিতাইচন্দ্র পালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ মোহন পালও বর্তমানে একজন নিপুণ শিল্পী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহার দ্বারাই যোগীভাইয়ের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি তৈয়ারী করাইবার কথা হইতেছে।সময় অল্প সেইজন্য আশ্রমের অক্লান্ত কর্মী শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজীকে শ্রীশ্রীমা মূর্তির জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন। তাঁহার নির্দেশ ও পছন্দ অনুসারেই এই বিগ্রহ দুইটি অষ্টধাতুর দ্বারা নির্মাণ করান হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব ভক্তগণ যুগলের উপাসক। তাঁহারা শ্রীমতী রাধারাণীর পার্শ্বে শ্রীরাধারমণকে দেখিয়া অভ্যস্ত এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহই দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীছলিয়ার জন্য একখানি তাঁহার অনুরূপ শ্রীমতী রাধারাণীর বিগ্রহ আবশ্যক হইয়া পড়িল। যদ্যপি শ্রীছলিয়ার রাধারূপে তো শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীই আছেন, তথাপি ভক্তের মনোরঞ্জনের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের প্রতীকরূপে একখানি শ্রীরাধার মূর্তি নির্ম্মাণের আদেশ স্বামী পরমান্দজীর নিকট পৌঁছিল। এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্তদম্পতি শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ভবানী দেবী একখানি রাধা বিগ্রহ তৈয়ার করাইয়া সাদরে শ্রীশ্রীমাকে দান করিলেন। এই মূর্তিখানিই পাঠক ও পাঠিকারা শ্রীছলিয়ার বামে দেখিতে পান। তিনখানি মূর্তি নির্মাণ হইলে পর উহাদের উত্তমরূপে প্যাক করিয়া পরমানন্দজী সাথে করিয়া বৃন্দাবনে রওনা হলেন। মূর্তি নির্মাণকার্যে ও পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে শ্রীশ্রীমায়ের কতিপয় ভক্ত যথা, শ্রীঅনিল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহাদের সাহায্য যথাসময়ে না পাইলে বিগ্রহ তৈয়ার হওয়া কঠিন হইত। শ্রীশ্রীমায়ের কাজ করিয়া ইহারা সকলেই আনন্দ পাইয়া থাকেন সেইজন্য নিজেদের বহুমূল্য সময় ও পরিশ্রম দান করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন না। মূর্তি তিনখানির ওজনের পরিমাণ ১২মণ। বিগ্রহসহ স্বামীজীর বৃন্দাবন আশ্রমে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়াতে সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন। রংয়ের কাজ কিছু বাকী ছিল বলিয়া কলিকাতা হইতে দুইজন কারিগর আসিয়া তাহা সমাপ্ত করিয়া গেলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ স্থাপনের দিন স্থির হইল ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সালের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর শুভ দিবসে। এবার ঐদিন বুধবার ও রোহিণী নক্ষত্র পড়াতে জয়ন্তী হইয়াছে। এইরূপ তিথি, বার ও নক্ষত্রের সংযোগ প্রতি বৎসর পড়ে না- এই বৎসর উহা পড়াতে মান অধিক হইয়াছে। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে মণ্ডপ প্রবেশ, পরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও ব্রতীদের বরণ হইল। সোলনের রাজা সাহেব শ্রীদুর্গা সিংহ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আশ্রমে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীমান্ নির্মলানন্দ ব্রহ্মচারীকে বরণ করিলেন। পরে যথাক্রমে আচার্য, ব্রহ্মা, সদস্য প্রভৃতি বরণান্তে ঐ দিনের কার্য্যসূচী সমাপ্ত হইল। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের প্রতিনিধিরূপেও ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দই সর্ব প্রকার আনুষ্ঠানিক কার্য করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন গণপতি স্থাপন, ষোড়শ মাতৃকা, নবগ্রহ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও যথা স্থানে আবাহিত ও ষোড়শোপচারে পূজিত হইলেন। তৃতীয়দিনে বিগ্রহ চারিটিকে চাউলের মধ্যে ও যমুনার পবিত্র জলে শায়িত করিবার পর উঠাইয়া মণ্ডপে শয্যায় শয়ন দেওয়া হইল এবং যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন হইল। চতুর্থ দিবস বাদ্যভাণ্ড ও খুব ধুমধামের সহিত রাজোচিত ভাবে বিগ্রহ চারিটিকে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয়

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না কলিকাতা হইতে শ্রীমতী ভবানী দেবী বিগ্রহের জন্য রূপার মুকুট ও অলঙ্কারাদি এবং জয়পুর হইতে শ্রীমতী কমলা মোহনলাল জরির মূল্যবান নানাপ্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও বৃন্দাবন হইতে দুইটি যুগল মূর্তির জন্য জরির উপর নানা জাতীয় ও রংয়ের পাথর ও মুক্তা খচিত দিব্য সুন্দর মুকুট নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। এই শোভাযাত্রার পরিচালনার এবং সাজসজ্জার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী মহারাজ। শোভাযাত্রাটি বাস্তবিকই একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। ঢাকাতে পূর্বে যেমন জন্মাষ্টমীর সময় নানাবিধ চৌকি সাজান হইত এই শোভাযাত্রাটিতেও তদ্রূপ সাজান হইয়াছিল। প্রথম চলিলেন সর্বসিদ্ধিদাতা গণনায়ক শ্রীগণেশ, তাহার পর ক্রমান্বয়ে শ্রীহনুমানজী, তপস্যানিরত হিমালয়ের কন্যা তুষার মধ্যে দেবী পার্বতী, রাসমণ্ডলে গোপীপরিবৃত যুগলরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, কালিয়দমন, দেবগণে সুশোভিত রাজসভাতে দেবরাজ ইন্দ্র ও সমাধিলগ্ন ধূর্জ্জটির মস্তকে গঙ্গাবতরণ। তৎপশ্চাতে পাল্কীতে চলিলেন ৪০০ বৎসরের পুরাতন গণেশের বিগ্রহ সহ শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম প্রাপ্ত পিতলের শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

এই দুইটির সম্বন্ধে কিছু না বলিলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই ৪০০ বৎসরের পুরাতন গণেশ মূর্তিখানি বম্বের শ্রীবি, কে. শাহার কন্যা শ্রীমতী সুনয়না জয়পুর হইতে খরিদ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রদান করেন। দুইখানি মূর্তি তিনি ৫০০ টাকায় ক্রয় করিয়া একখানি মাকে দেন, অপরখানি বম্বেতে তাঁহার পিতৃগৃহে অবস্থিত আছেন শ্রীশ্রীমা প্রথম যখন শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত শ্রীমতী রমা (রেলের শ্রীবীরেন্দ্র সক্সেনার মাতা) এবং তাঁহার ছোট ভগ্নী শ্রীমতী কমলা (যোধপুরের কলেক্টর শ্রীআনন্দ মোহনলালের মাতা) গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন একখানি ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্তি আনিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রদান করেন। ইহার পূর্ব্বে কেহ কোন দেবতার মূর্তি এইরূপে তাঁহাকে দেয় নাই। তিনি এই ছোট্ট বিগ্রহটিকে তাঁহার অতি পুরাতন ভক্ত অধুনা বৃন্দাবন বাসী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়কে দিয়া বলেন, "বাবা- তুমি এই বিগ্রহটিকে তোমার নিকট উপস্থিত রাখিয়া দেও।' তদবধি এই মূর্তি তাঁহার কাছেই আছেন। মা বিগ্রহকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর, 'তোমার স্থান তুমি করিয়া লও।" যখন যখন মা বৃন্দাবনে আসিতেন তখন খেয়াল হইলে এই মূর্তিটিকে আশ্রমে আনিয়া রাখিতেন। বৃন্দাবন আশ্রম হইতে যাইবার সময় পুনরায় যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এই বিগ্রহই তাঁহার স্থান এইভাবে করিয়া লইয়াছেন।

পুনরায় শোভাযাত্রা প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। শোভাযাত্রার সর্বশেষে পৃথকপৃথক বৃষের সুসজ্জিত রথে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি এবং শ্রীছলিয়াকৃষ্ণ রাধারাণীর সহিত বিরাজিত ছিলেন। এই দুই রথে আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা কেহ চামর, কেহ ছত্র ধারণ করিয়া চলিতেছিলেন। বলা বাহুল্য এই মিছিলে চৌদ্দমাদল সহ বৈষ্ণবদের নাম কীর্তন এবং আশ্রমের ছেলেমেয়েদের কীর্তনের পশ্চাতে বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা সাধু মহাত্মাদের লইয়া শোভাযাত্রার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহার পুরোভাগে স্থানীয় বৈষ্ণবআখড়ার সাধুরা তরবারি, লাঠি ও বনেঠি লইয়া নানাপ্রকার খেলা প্রদর্শন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। এক সুসজ্জিত হাতীর উপর চলিতেছিলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সংঘের উপ-সভাপতি (Vice - President) শ্রীমৎ স্বামী ভাগবতানন্দ গিরিজী মহারাজ। বৃন্দাবন নগর পরিভ্রমন করিয়া শোভাযাত্রার আশ্রমে ফিরিতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগিয়াছিল। এই মিছিল দেখিয়া স্থানীয় বৃদ্ধরা বলিয়াছিলেন ৫০ বৎসরের মধ্যে এই প্রকার শোভাযাত্রা শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাহির হয় নাই। নগর ভ্রমনের পর সুন্দর শয্যায় চারিটি বিগ্রহকে পাশাপাশি রাখিয়া শ্রমোপনোদনের জন্য মণ্ডপে বিশ্রাম দেওয়া হইল।

জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিন হইতে অষ্ট প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে স্বত:স্ফূর্ত নাম "শ্রীকৃষ্ণছলিয়া আনন্দলাল। ব্রজরমণ প্রাণগোপাল" কীর্তন হইল। যে কয়দিন উৎসব চলিতেছিল সে কয়দিন প্রত্যহ মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর ও শ্রীমদ্ভাগবতের অতিশয় মর্মজ্ঞ ও রসিক শ্রীমৎ স্বামীঅখণ্ডানন্দ

সরস্বতীজীর সারগর্ভ ভাগবতীয় ভাষণ হইত। এই সময় এত লোক হইত যে বিরাট হল ভরিয়া যাইত। স্থানের অভাবে ভক্তপ্রাণ শ্রোতাগণ বাহিরে থাকিয়া মহাত্মাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। শ্রীহরিবাবা প্রভৃতি বৃন্দাবনের সাধু-সন্তানগণ ঐ সময় উপস্থিত থাকিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। এই শুভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতের নানাস্থান হইতে শ্রীশ্রীমায়ের শত শত ভক্ত সন্তানগণ আসিয়া এই বিরাট অনুষ্ঠানটিকে সর্বতো ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে মন্দিরের মধ্যে শ্বেত মর্মরের বিস্তৃত বেদীর উপর স্থাপন করা হইল। পরে পূর্বাহ্নে শ্রীধাম বৃন্দাবনের তথা বাহির অইতে আগত সুপ্রসিদ্ধ সাধু মহাত্মাদের উপস্থিতিতে দুইটি যুগল মূর্তির এবং গণেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রানুসারে করা হইল। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় পরম শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমা. যজমান শ্রীনির্মলানন্দ ব্রহ্মচারীকে স্বীয় করকমলের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন। ইহার পর উপস্থিত সকল সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণ-একে একে বিগ্রহের স্পর্শদ্বারা আপন শক্তি অনুযায়ী শক্তি সঞ্চার করিলেন। মহাত্মাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বম্বের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ মহেশ্বরানন্দ গিরিজী, বৃন্দাবনের বৃদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা শ্রীহরিবাবাজী মহারাজ, ভাগবতের রসিকমর্মজ্ঞ শ্রীমৎ অখণ্ডানন্দ সরস্বতী, শ্রীমৎ অবধূতজী, বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীচক্রপাণিজী. স্থানীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও অন্যান্য সাধু মহাত্মাগণ। রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়া রাজে এবং সোলনের রাজা সাহেব শ্রীদুর্গা সিংহজীও বেদীর উত্তর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিগ্রহদের ভক্তিহৃদয়ে তন্ময় হইয়া স্থির নেত্রে অবলোকন করিতেছিলেন। এতদিনে পিতামহীর সংকল্প পূর্ণ হইল দেখিয়া যোগীভাই দুর্গাসিংহের মুখে একটা তৃপ্তি ও আনন্দের ঝলক দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। শ্রীছলিয়া এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কতই না ছল করিয়া অবশেষে আপন লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া রাজমাতার চোখে মুখে শান্তির ছায়া ফুটিয়া উঠিল। ছলিয়া আর ছলনার জালে তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিবে না। শ্রীমতী রাধার প্রেমে বাঁধা পড়িয়া চির-চঞ্চল অচঞ্চল হইয়া "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিলেন। রাত্রি আটটার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া তিনি একান্তে শ্রীশ্রীমাকে রাধারূপে শ্রীছলিয়ার পার্শ্বে বসাইয়া রাজোচিত ভাবে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। সুবর্ণ নির্মিত মূল্যবান কণ্ঠহার ছলিয়াকে এবং মায়ের প্রতীক. রাধারাণীকে প্রদান করিলেন।পূজান্তে স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা শ্রীশ্রীযুগল মূর্তির ভেট দিলেন। রাত্রি বারটার সময় শ্রীশ্রীমায়ের এবং নানাস্থান হইতে আগত মাতৃভক্তগণের উপস্থিতিতে আশ্রমের ব্রহ্মচারী শ্রীনির্বাণানন্দজী অতিশয় নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রীয় বিধি বিধান মতে শ্রীশ্রীযুগলমূর্তি দুইটির মহাঅভিষেক ও পূজা করিলেন। রাত্রি তিনঘটিকার সময় পূজান্তে সকল ভক্তগণ দেবতাদের ও মাতৃচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া জন্মাষ্টমী ব্রতের পূর্ণাহুতি সমাপন করিলেন।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ স্থাপনার কয়েকদিন পরে শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ও রাসক ভক্ত শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহারাজ একদিন সন্ধ্যার সময় বিগ্রহ দর্শনে আসিয়া মন্দিরের সন্মুখে ও শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বারে বসিয়া শ্রীযুগল মূর্তির সেবার উপর একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি সে সময় শুনিয়াছিলেন গোওয়ালিয়রের রাজমাতা শ্রীমতী বিজয়া রাজের বিগ্রহটির নাম শ্রীআনন্দছলিয়াকৃষ্ণ রাখা হইয়াছে। সাথে সাথে তিনি সোলনের রাজা সাহেব শ্রীদূর্গাসিংহজীর বিগ্রহটির নাম 'শ্রীআনন্দ কৃষ্ণ' রাখিলেন। তদবধি ইঁহাকে কেহ কেহ 'শ্রীআনন্দকৃষ্ণ' বলিয়া থাকেন।
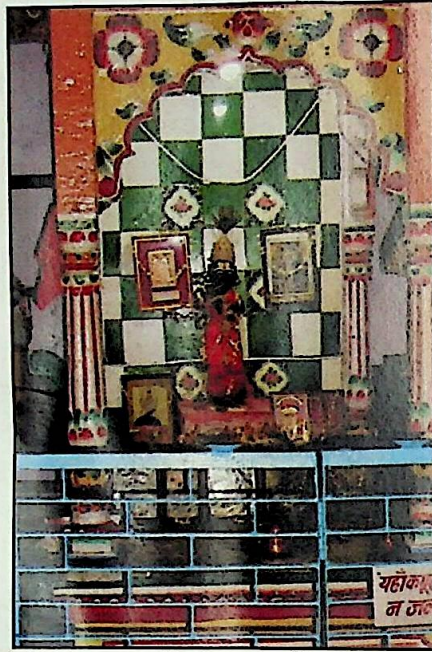
সাক্ষী গোপালরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি, শ্রী তৈলঙ্গ স্বামী মঠ।

শ্রী তৈলঙ্গ স্বামীজীর মঠ।

'ধন্য কাশী পুণ্যধাম'

ব্রহ্মচারিণী গীতা

শ্রী তৈলঙ্গ স্বামীর মঠ-

কাশীর সচল বিশ্বনাথ শ্রী তৈলঙ্গ স্বামী কাশীতে নিজের সেবক শ্রী মঙ্গলভট্টের প্রাঙ্গনে থাকতেন। এখানেই জীবন লীলার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বাস করে গেছেন। ভক্তের অনুরোধে তাঁর মনো কামনা পূর্ণ করার জন্য নিজেই নিজের মূর্তিতে স্বয়ং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আমরা গিয়ে দেখলাম সেখানেও আরতি হচ্ছে। সেখানে সাক্ষীগোপালরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রয়েছে। বড় শিব রয়েছেন। মা কালীর মূর্তি শ্রীতৈলঙ্গ স্বামীর মূর্তি সকলের আরতি হল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে তৈলঙ্গ স্বামীর সমাধি দর্শন করলাম।

আজ থেকে চারশত বৎ সর পূর্বে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অন্তর্গত বিজনা নামক জেলার হোলিয়া প্রদেশের অন্তর্গত নৃসিংহ ধর নামক এক ঐশ্বর্যশালী জমিদার ছিলেন। তাঁর প্তনীর নাম বিদ্যাবতী। বিদ্বাবতী অতিশয় বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ণ, ভক্তিমতী, স্নেহময়ী দেবীস্বরূপা ছিলেন। তাঁদের কোন সন্তানাদি ছিল না। শ্রী গৌরীশংকরের আরাধনা করে ১০১৪ বঙ্গাব্দে ইং ১৬০৭ সালে তাঁদের এক পুত্র জন্ম হয়। তাঁর নাম শ্রীতৈলঙ্গ ধর রাখা হয়। জন্ম হতেই শিশুর মধ্যেঅলৌকিকত্ব দৃষ্টি গোচর হয়। একদিন মাতা শিবের আরাদনা করছেন হঠাৎ দেখলেন এক জ্যোতি শিবলিঙ্গ হতে বের হয়ে মন্দির আলোকিত করে ধীরে ধীরে বারান্দায় শায়িত শিশু তৈলঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল। মাতা পিতা বুঝতে পারলেন এই শিশুটি শিবের অংশে জন্মগ্রহন করেছে। যথা সময়ে চূড়া করণ ও উপনয়ণ সংস্কার করালেন। তাঁর একটি ছোট ভাইও হয় নাম শ্রীধর। শৈশবের নাম চিল তৈলঙ্গস্বামীর শিবরাম। শিবরাম পড়াশুনায় ভাল ছিলেন। মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। মা বিদ্যাবতী ও অনন্য সাধারণ মহিলা ছিলেন। তিনি পুত্রকে শিব জ্ঞানে লালন পালন করেছিলেন। শিবরাম কিন্তু সংসার হতে উদাসীন ছিলেন। ভগবৎ প্রাপ্তিই তাঁর লক্ষ্য। তাই পিতা তাঁর উপযুক্ত বয়সে পুত্রের বিবাহের জন্য চিন্তান্বিত হলেন। পুত্রতো কিছুতেই বিবাহ করবেন না। মাতার কথায় পিতা বিরত হলেন। শিবরামের যখন ৪০ বছর বয়স তখন তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। মাতার আদেশেই শিবরাম ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য সাধনা আরম্ভ করলেন। শিবরামের ৫২ বৎসর বয়সে মাতা পরলোকগতা হলেন। মাতৃ বিয়োগে তিনি অত্যন্ত দু:খিত হলেন। মাতার পারলৌকিক কার্যাদি করে শ্মশানেই মায়ের চিতার ভস্ম সারা শরীরে ধারণ করে ভগবদ্ আরাধনায় মগ্ন হলেন। ভাই এসে অনেক বোঝাল কিন্তু তিনি আর বাড়ী ফিরলেন না। ভাই তখন শ্মশানেই অগ্রজের জন্য একটি কুটিয়া নির্মাণ করে দিলেন আর তাঁর খাবার ব্যবস্থা করলেন।

তৈলঙ্গ স্বামী এই জগতে ২৮০ বছর ছিলেন। অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে দেখা যায়। ১৬৭৯ সালে স্বামী ভাগীরথানন্দ সরস্বতী শিবরামের মাতৃ শ্মশানে এসে উপস্থিত হন। দুজনেই দুজনকে দেখে প্রভাবিত হন। ভগীরথ স্বামী শিবরামকে দীক্ষা দেন ১৬৮৫ সালে। শিবরামজীর নাম হয় শ্রীগণপতি স্বামী।

শিবরামজী শৈশবেই সংকল্প করেছিলেন যে মাতার পরলোক গমনের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহন করবেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল যে মা একবার তাঁকে বলেছিলেন যে শিবের আরাধনায় তাঁর জন্ম হয়। তখনই তিনি বিধি বিধান সহ ১২ জন ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই ১২ জন ব্রাহ্মণ সেবার কি ফল হয় জানতেন না শিবরামকে বলেছিলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি এই ১২ জন ব্রাহ্মণ সেবার কিফল হয়? জানবে আমার কথা মনে রেখো।"

শিবরাম মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন। তিনি কাশী এলেন সকলকে ব্রাহ্মণ সেবার ফল জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কেউ বলতে পারলেন না। কাশীর এক পণ্ডিত বললেন,-"তুমি বঙ্গদেশে যাও। বর্ধমান

জেলার কাটোয়া গ্রামে উদ্ধরণ পুরে এক ব্রাহ্মণ রঘুনাথ ভট্টাচার্য তোমার প্রশ্নের জবাব দেবেন।"

শিবরামজী বঙ্গদেশে গিয়ে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে গেলেন। তাঁকে মায়ের প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, "একজন ব্রাহ্মণ সেবার ফলই অনন্ত, ১২জন ব্রাহ্মণ সেবার ফল কেমন করে বলা যাবে? তুমি নর্মদার তটে গিয়ে একান্তে সম্পুট চণ্ডীপাঠ কর এক সপ্তাহ পর্যন্ত। সম্পুট পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই তোমার কাছে এক মহাপুরুষ আসবেন তিনি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবেন।" শিবরামজী তাঁর কথামত নর্মদাতটে গিয়ে একান্তে বসে সম্পুট চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করলেন। পাঁচদিন পর তাঁর কাছে বাঘছাল পরা জটাজুট ধারী ত্রিশূল হাতে একমহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন। একটু পরে গেরুয়া বস্ত্র পরিহিতা এক ভৈরবী ও এসে দাঁড়ালেন।সূর্যাস্তের সময় সম্পুট পাঠ শেষ করে শিবরামজী ঐ পুরুষের কাছে মায়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। ঐ মহাপুরুষ মহাযোগিনীকে বললেন, "হে দেবী! তোমার ঝুলিতে তিনটি গুলি আছে। তুমি একে দাও।" তারপর শিবরামজীকে বললেন, "এখানে এক পর্বতীয় দেশের রাজা আছে। তাঁর কোন সন্তান নেই। তাঁর রাণীকে এই গুলি খাওয়ালে তাঁর এক পুত্র হবে। সেই নবজাত শিশুই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবে।" এই বলে তাঁরা চলে গেলেন।

সাতদিন পর্যন্ত সম্পুট পাঠ করে শিবরামজী অতিশয় ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। তিনি দোকানে গিয়ে কিছু খেয়ে চলতে চলতে একটি গাছতলায় গিয়ে বসলেন। সেখানে এক ব্যাক্তি ঘাস কেটে ঘাসের গাঁটরী নিয়ে গাছতলায় এসে বসল। শিবারামজী তাঁর জাতি জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে সে জাতিতে গোয়ালা সে জানাল যে রাত্রিতে এখানে বিশ্রাম করে সকালে রাজধানী যাবে শিবরামজীও বললেন যে তিনি ও রাজধানী যাবেন। তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘাস কাটারীকে বললেন, "আমার পায়ে ব্যাথা একটু পা টিপে দাও।" এই বলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে দেখেন ঘাস কাটারী মরে গেছে। তার সৎকার করে শিবরামজী রাজধানী পৌঁছালেন।

সেখনকার রাজা নি:স্তান। শিবরামজী বললেন যে আমার কাছে এমন গুলি আছে যা খেয়ে রাণীর অবশ্য পুত্র সন্তান হবে। রাজা প্রথমে আগ্রহান্বিত হলেন না কারণ এরূপ অনেক জড়িবুঁটি ইতিপূর্বে রাণীকে খাওয়ানো হয়েছে কিন্তু কোনই ফল হয়নি। শিবরামজী যখন বললেন যে সন্তান হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজমহলেই থাকবেন। তখন রাজা তাঁর থেকে গুলি নিয়ে রাণীকে খাওয়ালেন। শিবরামজী বললেন, রাজাকে, "আমার একটি শর্ত রয়েছে আপনার পুত্র সন্তান হলে আমাকে একবার সূতিকা গৃহে যেতে দিতে হবে।" রাজা স্বীকৃত হলেন।

দশমাস পর যথাসময়ে রাজার একপুত্র সন্তানের জন্ম হল। রাজ্যে হইচই পড়ে গেল চতুর্দিকে আনন্দের রব উঠল। এদিকে শিবরামজী সূতিকা গৃহে প্রবেশ করলেন। নবজাত শিশুটি জোরে জোরে হাসতে লাগল এর কারণ জানার জন্য শিবরামজী ধ্যানে বসলেন তিনি জানতে পারলেন যে ঐ গোয়ালাই সেদিন রাত্রিতে যে তাঁর পদ সেবা করেছিল সেই পুণ্যের ফলে রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। নিষ্কাম ভাবে একটি রাত্রি ব্রাহ্মণের পদ সেবার দরুন সে গোয়ালা হতে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেছে ১২ জন সেবার ফল তো ব্রহ্মপ্রাপ্তিই।

এইরূপ অনেক ঘটনা আছে তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনে। বহুমৃতকে জীবন দান করেছেন। তাঁর আকাশ, পৃথিবী, পাতাল এবং জলে প্রবেশ করার সিদ্ধি প্রাপ্ত ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ শিবযোগী তৈলঙ্গস্বামী নিজের জীবনের অন্তিম ১৫০ বছর কাশীধামেই অতিবাহিত করেছেন।

তৈলঙ্গ স্বামীর মঠ হতে আমরা মঙ্গলাগৌরী গেলাম।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়

-ডাঃ কবিতা ব্যাস (আয়ুর্বেদাচার্য)

আমি অমৃত বার্তায় গত দুই সংখ্যায় আহার এবং দিনচর্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, অনেকের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকে যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রটি কি? আয়ুর্বেদ কি শুধু 'জড়ীবুঁটির' বিষয়েই বর্ণনা আছে? না আরো ও কিছু আছে? তাই এবারের সংখ্যায় আয়ুর্বেদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। আপনাদের যদি কোন জিজ্ঞাসা অথবা স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যার সমাধান চাই তো গীতাদিকে পত্র লিখে অথবা ইমেল (amritvarta.vns@gmail.com) এর মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারেন সেই সব প্রশ্নের সমাধান আগামী সংখ্যায় করা হবে।

আয়ুর্বেদের উৎপত্তি-

আয়ুর্বেদ অর্থববেদের উপবেদ। ঋগ্বেদে ও অন্য অনেক 'জড়ীবুঁটি'র বর্ণন আছে, তাই আয়ুর্বেদ বেদের মতই অতি প্রাচীন শাস্ত্র। আয়ুর্বেদের প্রথম উপদেশ পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা দক্ষপ্রজাপতিকে দিয়েছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি অশ্বিনী কুমারদের আয়ুর্বেদের জ্ঞানোপোদশ দিয়েছিলেন এবং অশ্বিনী কুমাররা ভগবান ইন্দ্রকে এই জ্ঞান দিয়েছিলেন। যখন পৃথিবীতে রোগের বৃদ্ধি হল, তখন হিমালয়ের দেশে ঋষিমুনিদের এক সভা হল, তাতে সকলে বিচারবিমর্শ করলেন যে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ- এই চতুবর্গের মুখ্য সাধনতো আরোগ্য লাভই। রোগ ঐ আরোগ্যকে নষ্ট করে চতুবর্গপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই সেই ঋষিমুনিরা ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন, এবং ধ্যানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে আমাদের মধ্যে একজন আমাদের প্রতিনিধি হয়ে ভগবান ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদের জ্ঞানপ্রাপ্ত করতে যাবে। এই কাজের জন্য ঋষি ভরদ্বাজকে মনোনীত করা হল। এই প্রকারে আয়ুর্বেদের পৃথিবীতে অবতরণ হল।

আয়ুর্বেদের পরিভাষা-

আয়ু অর্থাৎ জীবন,বেদের অর্থ হল জ্ঞান। যা থেকে জীবনে সুস্থ শরীরে বাঁচার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। তাকেই আয়ুর্বেদ বলা হয়। আয়ুর্বেদের পরিভাষা দিতে গিয়ে আচার্যচরক বলেছেন-" চারপ্রকারের আয়ু আছে।

১. সুখায়ু- নীরোগী কায়াতে জীবনে বেঁচে থাকাকে সুখায়ু বলা হয়।
২. দু:খায়ু- রোগের দ্বারা গ্রস্ত যে জীবন তাকে দু:খায়ু বলা হয়।
৩. হিতআয়ু- সমাজের জন্য উপযোগী জীবনকে হিতআয়ু বলা হয়।
৪. অহিত আয়ু- সমাজ এবং অপরের দু:খদায়ক জীবনকেই অহিত আয়ু বলা হয়ে থাকে।

এই চার প্রকারের হিত এবং অহিতের বিষয়ে যে শাস্ত্র বলে তাকেই আয়ুর্বেদ বলা হয়। আয়ুর্বেদ আয়ুর প্রমাণ ও বলে দেয়।

উপরে বর্ণিত পরিভাষাতে এই অর্থ স্পষ্ট হল যে আয়ুর্বেদ শুধু ওষুধের কথাই বলে না কিন্তু জীবনে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার একটি অতি উপযোগী বিদ্যা বা বিজ্ঞান ও বটে। যার থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে নিজে কি প্রকারে সুস্থ জীবন যাপন করব এবং সমাজে থেকে কি প্রকারে সমাজের উপযোগী জীবন যাপন করব।

আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য-

আয়ুর্বেদের দুইটিই উদ্দেশ্য-

১. সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা করা।
২. রোগী ব্যক্তির উপচার অর্থাৎ চিকিৎসা করা।

১. প্রথম উদ্দেশ্যের পূর্তির জন্য আয়ুর্বেদে আহার, দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, অগ্নিদোষ, প্রকৃতি, প্রকৃতি অনুসারে ভোজন,

রসায়ন ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আমি এখন পর্যন্ত আহার এবং দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, (প্রতি সংখ্যায় একটি ঋতুর) বর্ণন করেছি। দোষ, প্রকৃতি, অগ্নি ইত্যাদির বর্ণন ও আমি আগামী কিছু সংখ্যায় প্রস্তুত করব।

২ আয়ুর্বেদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল রোগীর উপচার করা। আয়ুর্বেদে রোগীদের উপচারের জন্য প্রধানত: 'জড়ীবুঁটির' প্রয়োগই ওষুধ রূপে করা হয়। আয়ুর্বেদে কিছু ওষুধ যা ধাতু এবং পারদ ইত্যাদির প্রয়োগে রসশাস্ত্র বিভাগে নির্মিত হয়। এর জন্য ধাতুদের ওষুধরূপে পরিবর্তিত করার জন্য কয়েক মাস ধরে 'জড়ীবুঁটি' দের স্বরসে ভিজিয়ে খলে পিষে পিষে এত হাল্কা করে দেওয়া হয় যে পিষ্ট হয়ে সেই ধাতু ওষুধে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আয়ুর্বেদে মাত্রার খুব মহত্ত্ব রয়েছে। চরক সংহিতাতে বলা হয়েছে যে আহার যদি মাত্রার অধিক করা হয় তবে বিষ হয়ে যায় আর যদি বিষ ও উচিত মাত্রাতে সেবন করা হয় তবে ওষুধের কাজ করে। তাই আয়ুর্বেদের ওষুধ আয়ুর্বেদের চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করা উচিত।

প্রায়ই লোকেরা বলে যে আয়ুর্বেদের ওষুধ দেরীতে কাজ করে- কেন এমন হয়? আমার তাদের কাছে এই বক্তব্য যে আমাদের কাছে ৮০ প্রতিশত রোগীরাই এমন আসে যারা ইংরাজী ওষুধ খেয়ে খেয়ে নিজের শরীর পূর্ণ রূপে কমজোর করে ফেলেছে। তারপর তারা আয়ুর্বেদের দিকে মন দেয় ও চায় যে তখনই তাদের আরাম অর্থাৎ আরোগ্য লাভ হোক। একটি আয়ুর্বেদের চিকিৎসককে সেই রোগীদের শরীর থেকে ইংরাজী ওষুধের বিষাক্ত প্রভাব (side effects) দূর করতে অনেক সময় লেগে যায়। দ্বিতীয় কারণ এই যে আয়ুর্বেদের ওষুধ রোগের জড়ে গিয়ে কাজ করে তাই তার সময় বেশী লাগে।

এই কথা বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যদি আপনার ঘরের দেওয়াল কমজোর হয়ে যায়, ময়লা হয়ে যায় তবে কোন লোক যদি এসে বলে যে সে দুই দিনে পেন্ট করে দেবে ও পয়সাও কম নেবে কিন্তু অন্যব্যক্তি যদি বলে যে সে আপনার ঘরের দেওয়াল চার দিনে পেন্ট করতে পারবে কারণ সে আগে দেওয়ালে সিমেন্ট ইত্যাদি ভরবে যাতে দেওয়ালের গর্ত ও প্লাসটার যে খসে গিয়েছে,তা ভরাট করে তারপর পেন্ট করবে কিন্তু দেওয়াল মজবুত হয়ে যাবে যদিও পয়সা একটু বেশী লাগবে। তবে আপনি কোন পেন্টারকে চয়ন করবেন? শরীর ও আপনার আত্মার ঘর অনুচিত আহার- বিহার, দিনচর্যা এবং বয়সের অনুপাতে শরীরের দেওয়ালে ও কমজোরী এসে যায়। আয়ুর্বেদের ওষুধ আগে আপনার শরীরের দোষ-বাত-পিত্ত-কফের অসমতাকে ঠিক করে তারপর রোগের জড়ে গিয়ে কাজ করে আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শরীর মজবুত রাখে, আর কোন সাইড ইফেক্টও করে না। তাই আপনাকে নির্ণয় নিতে হবে যে আপনি দুইদিনে ঠিক হতে চান না রোগের জড় পর্যন্ত ঠিক করে তিন চার দিনে ঠিক হবেন? হ্যাঁ, সময়ের সমস্যা রয়েছে। আজকাল সকলে ব্যস্ততার জীবন যাপন করছে। আজ এখানে কাল সেখানে কার্যোপলক্ষে লোকেদের দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কিন্তু তবু স্বাস্থ্য অপেক্ষা কোন কিছুই মূল্যবান নয়। একবার যদি আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় তবে যতই ধন উপার্জন করে থাকুন স্বাস্থ্য আর ফিরে পাবেন না।

কিছু রোগ এমন আছে যেমন গাঁটের বাত ব্যাধি, ডায়বিটিজ, ব্লাডপেশার, মানসিকরোগ, অনিদ্রা, টেনশন, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগের এ্যালোপ্যাথিতে ও দীর্ঘদিন চিকিৎ সা চলতে থাকে- কয়েক মাস ধরে চিকিৎসা চলে অথবা সম্পূর্ণ জীবনই চিকিৎসা চলে, কিন্তু কোন গ্যারান্টী ও দিতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত রোগের আপনি যদি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করান তবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চিকিৎসা চলবে কিন্তু কোন সাইড ইফেক্টও হবে না। কিন্তু এ্যালোপ্যাথিতে আপনি কিডনী রোগের ওষুধ খাচ্ছেন তো সেই ওষুধের সাইড ইফেক্টে লিভার খারাপ হয়ে যাবে। শুধু কথার কথা নয় আমি অনেক রোগীকে দেখেছি যারা ইংরাজী ওষুধের দুষ্পরিণামের দুর্ভোগ ভুগে চলেছেন।

আয়ুর্বেদ শরীরের সঙ্গে মন ও আত্মাকে একীকৃত করে চিকিৎসার কথা ভাবে ইংরাজী চিকিৎসাতে শরীরের

বিভিন্ন অঙ্গের রোগের আধারে চিকিৎসা করা হয়। যেমন কিডনী রোগের বিশেষজ্ঞ,চর্মরোগের বিশেষজ্ঞ, হৃদয়রোগের বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। অতএব ইংরাজী চিকিৎসা পদ্ধতিতে একীকৃত চিন্তা (Holistic Approach) নেই। কিন্তু আমাদের চিকিৎসাতে শরীরের সম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একে অপরের সমন্বয় রেখে শরীরের স্বাস্থ্যকে অটুট ও সুদৃঢ় রাখে। তাই আয়ুর্বেদে সমস্ত শরীরের ভারসাম্য দেখেই চিকিৎসা করা হয়। একজন যোগ্য আয়ুর্বেদের চিকিৎসক প্রথমে আপনার নাড়ী পরীক্ষা করে তারপর ওষুধ লিখবে। আয়ুর্বেদে নাড়ী পরীক্ষার অর্থ শুধু নাড়ীর গতি দেখা নয়- এ-এক অত্যন্ত গভীর বিজ্ঞান যা গুরু শিষ্য পরম্পরাতে এখন পর্যন্ত জীবিত আছে, নাড়ী পরীক্ষায় দোষ সমূহের অবস্থিতি ও রোগের গম্ভীরতার তথ্য জানা যায়।

আর্য়ুবেদ শাস্ত্রের অন্যান্য বিশেষতা-

আর্য়ুবেদ শাস্ত্র এক শ্বাশত বিজ্ঞান অর্থাৎ তা চিরকাল একই রকম থাকে। কিন্তু ইংরাজী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এমন নেই।তা কালের গতি অনুসারে বদলে যায়। প্রথমে ইংরাজী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত অনুসারে Penicillin পরে সাল্ফা ড্রাগ ইত্যাদি শরীরের জন্য ভাল মানা হত তারপর অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রচলন বৃদ্ধি হতে লাগল এবং কিছুদিন পরে নতুন গবেষণা করে জানতে পারা গেছে যে শরীরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খুব ক্ষতি কারক। বাচ্চাদের অ্যান্টিবায়োটিক বেশী দিলে তাদের ডায়বিটিজ রোগ হওয়ার আশংকা থাকে। এই জন্য আজকাল বেশীর ভাগ লোক আর্য়ুবেদ, যোগ ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতিতে মন দিচ্ছেন।.

আর্য়ুবেদের আর একটি বিশেষতা হল" শোধন চিকিৎসা" অর্থাৎ শুদ্ধি করণ। আয়ুর্বেদে ওষুধের মাধ্যমে দোষ সমূহকে শুধু দাবিয়ে দেওয়া হয় না কিন্তু এমন ওষুধ দেওয়া হয় যে আপনার দোষ সমূহকে পূর্ণরূপে শরীর থেকে বের করে বাইরে করে দেয়, শোধন চিকিৎসাকে আয়ুর্বেদে পঞ্চকর্ম চিকিৎসাও বলা হয়।

তাই স্পষ্টরূপে বোঝা গেল যে আর্য়ুবেদ শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানই নয় কিন্তু জীবনে স্বভাবিকভাবে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগকে শুধু শরীরের উপরে উপরেই মানা হয়নি কিন্তু রোগের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মানসিক ও আধ্যাত্মিক কারণ ও খুঁজে বের করা হয়। আয়ুর্বেদ চেতনার দ্বারা স্বাস্থ্য প্রাপ্তির নির্দেশ দেয়, শুধু ওষুধের দ্বারা স্বাস্থ্য প্রাপ্তি নয়। আয়ুর্বেদে শরীরের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে এবং পরিবারে ব্যবহারের ওপরেও অনেক জ্ঞান দেওয়া হয়। যাকে আচার রসায়ন এবং সদ্‌বৃত্তের নামে আয়ুর্বেদের সংহিতাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্ষাঋতুতে আহারবিহার-

আয়ুর্বেদের অনুসারে বর্ষা ঋতুতে বাতের প্রকোপ হয় তাই জঠরাগ্নি খুব কম হয়ে যায়। বর্ষা ঋতুতে পৃথিবীতে জলের বিন্দু বেশী পতিত হয় তাই পৃথিবীর ভিতরের তাপ বাইরে এসে যায়। তাই এই ঋতুতে দিবানিদ্রা শরীরের পক্ষে ভাল নয়। এই সময় অধিক ব্যায়াম বা রৌদ্রসেবন করা উচিত নয়।

এই ঋতুতে বৃষ্টিতে বেশী ভেজা উচিত নয়এবং নদীতে স্নান করাও উচিত নয়।

এই ঋতুতে আমাদের ভোজনের সঙ্গে মধু মিলিয়ে খাওয়া উচিত।

এই ঋতুতে তাজা মাখন ও গোঘৃতের উপযোগ শরীরের পক্ষে লাভদায়ক।

এই ঋতুতে ভাতের সঙ্গে রুটি খাওয়া যেতে পারে। মুগের ডালের সূপ বানিয়ে পান করা ভাল, এই ঋতুতে আম এবং ভুট্টার আহার স্বাস্থ্যের জন্য বাঞ্ছনীয়।

এই ঋতুতে গোদুগ্ধ এবং দই বেশী খাওয়া ঠিক নয়। কারণ এই সময় গোরু সবুজ ঘাস খায়।

আশ্রমবার্তা

আনন্দস্বরূপেষু,

শ্রীশ্রীমায়ের বারাণসী আশ্রমে গত ১২ই এপ্রিল হতে ১৬ই এপ্রিল, ২০১৬ বিশেষ সমারোহের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের পূজায় বিশেষতা ছিল সুন্দর ভাবে "সঙ্গীত সন্ধ্যার" আয়োজন। তখন স্থানীয় লোকের বেশ ভীড় হত। এবারে মহাষ্টমীর দিন রাত্রিতে সন্ধিপূজার সময় ছিল ১:৫৩মি: থেকে ২:৪১মিনিট পর্যন্ত। পূজার পর ভোগ, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি সমাপনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করে আবার তাড়াতাড়ি রামনবমীর দিন দেবীর নবমীর পূজার আয়োজনে লেগে যেতে হল। দুপুরে ঠিক ১২টার সময় রাম জন্ম হয়। তখন শ্রীরামের পূজা সুন্দর ভাবে হয়েছে। দশমীর দিন সকলের চিত্ত বীণায় বিদায়ের সুর বেজে ওঠে। এদিন কলার বড়া পান্তা প্রসাদ বিশেষ উপাদেয় হয়। দেবীর প্রতিমা বিসর্জনের পর আনন্দ মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মদিন ১৯শে বৈশাখের আগমন বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ে প্রতিটি আশ্রম উৎসব মুখরিত হয়ে উঠল। এবারে ২রা মে মায়ের শুভ জন্মদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে নানা উপচারে কনখল ও অন্যান্য আশ্রমে পালিত হয়েছে। এবারে ২রা মে হতে ২৫- ২৬শে মে পর্যন্ত দীর্ঘ দিনের মায়ের ১২১ তম জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষে কনখলে আশ্রমবাসী ও মায়ের ভক্তদের সহযোগিতায় নানা অনুষ্ঠান ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শুভ অবসরে যথা সময় বিষ্ণু সহস্র নাম, শিব মহিম্ন স্তোত্র, অখণ্ড রামায়ণ পাঠ, সম্পূর্ণ গীতা পাঠ, মাতৃ চালিসা, পূজা ইত্যাদি শংকরাচার্যের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীশ্রী শতচণ্ডীপাঠ, পূজা ও যজ্ঞ সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এরই সঙ্গে ২১শে মে হতে ২৫শে মে রাসলীলা শংকরাচার্য হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০৮ কুমারী ও একাদশ বটুক পূজা ও ভোজনের দিন অপরূপ শোভা হয়েছিল। সব ব্রাহ্মণ কুমারীরা সারি সারি দেবকন্যাদের মত পূজা গ্রহণ করেছে আনন্দের সঙ্গে। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন কুমারী পূজা হল। এক দিনে রাত্রিতে মহিলা মাতৃ ভক্তেরা মা নাম কীর্তন করেছে। আনুসঙ্গিক কার্যক্রম উৎসবটিকে আরোও মনোজ্ঞ করে তুলে ছিল। যেমন অক্ষয় তৃতীয়াতে প্রতিষ্ঠ দিবস উপলক্ষে ৯ই মে সুন্দর পূজা অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে। ১১ই মে শংকর জয়ন্তীতে শংকরাচার্যের বিশেষ পূজা ও ভোলানাথের নির্বাণ তিথিতে বাবা ভোলানাথের বিশেষ পূজা ও ২১ জন সাধু ভোজন ১৩ই মে সম্পন্ন হয়েছে। ২১শে মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন স্থানীয় হাসপাতালে ফল বিতরণ হল। ২৫শে মে সুসজ্জিত মাতৃমন্দিরে সুন্দর পরিবেশে মায়ের তিথি পূজা সুসম্পন্ন হয়েছে। স্তবে-গানে-কীর্তনে ভক্তের আকুল আহ্বানে সকল ভক্তের হৃদয় মা ময় হয়ে উঠল। ২৬শে মে সকালে মাতৃ মন্দিরে গর্ভ পরিসরে প্রণাম করার জন্য সকলে প্রবেশ করে নিজেরা ধন্য মনে করে আনন্দিত হলেন। পরে সাধুদের ভোজন ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হল। নাম যজ্ঞ ২৬শে মে সন্ধ্যা হতে ২৭শে মে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

মায়ের প্রতিটি আশ্রমে নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিপ্রেমের সঙ্গে নানা উপচারে মায়ের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। উত্তরকাশী, রাজগীর, ভীমপুরা, রাঁচী, পুরী প্রভৃতি আশ্রম হতে উৎসবের অনুষ্ঠান সূচীর সংবাদ পাওয়া গেছে। বারাণসীর আশ্রমে তিথি পূজার দিন সুসজ্জিত ফুলের বাংলোতে মায়ের অপরূপ শোভা হয়েছিল।

কনখল আশ্রমে বিগত ৬ই জুন ২০১৬ হতে ১৪ই জুন ২০১৬ পর্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবক্তা স্বামী প্রণবানন্দজী।

❀

অমৃত লোকের পথযাত্রী

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে খুকু-

শ্রীশ্রীমায়ের অতিপুরাতন ভক্ত শ্রীশক্তি ঘোষের বোনঝি, মালদার নামী ডাক্তার কুমারী শুভলক্ষী বাসন্তী পূজার পবিত্র নবমী তিথিতে মা ভাগরথীর তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে সজ্ঞানে মায়ের চরণে চিরতরে লীন হয়েছে। আমরা সকলে তাঁকে 'খুকু' বলেই ডাকতাম। প্রতিবারের মত এবারে ও সে বাসন্তী পূজাতে যোগদান করতে এসেছিল। ১৫ই এপ্রিল সন্ধি পূজার পর প্রসাদ গ্রহণ করেছে। পূজার আঙ্গিনা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করল। নবমীর ভোরে উষাকীর্তন আরম্ভ হয়েছে। কিছুক্ষণ কীর্তন শুনে তারপর সে সঙ্গিনীর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা স্নান করতে গেল। স্নান করে ঘাটে এসে বসেছে। শরীর অসুস্থ বোধ করায় সঙ্গিনী ডাক্তার ডাকতে গেছে। এসে দেখে সব শেষ। অমৃত পথের যাত্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছে। তার উপলক্ষে তার অগ্রজ এসে কন্যাপীঠে কুমারী ভোজন করিয়েছে। মার পূজা হয়েছে। ধন্য খুকু যার এমন সুন্দর ভাবে মাতৃ চরণ প্রপ্তি হয়েছে। আমরা তার পরিবারবর্গে র জন্য মাতৃ চরণে সান্ত্বনা কামনা করি।

জয় মা।

❀

"It is the duty of a human being to make human birth, which is such a rare boon, successful. Otherwise he has to continue in the round of births and deaths."

—Shree Shree Ma

Sri N.K. Banerjee